শ্রদ্ধার্ঘ্য। দুষ্প্রাপ্য নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকার। শঙ্কু ও তারিণীখুড়ো। মানিকের মণিমাণিক্য

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৫৩ বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা
বৈশাখ ১৪২৮
৫ মে, ২০২১

সম্পাদক
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

নির্বাহী সম্পাদক
চুমকি চট্টোপাধ্যায়

কর্মাধ্যক্ষ
মানস চক্রবর্তী

কার্যালয়-সচিব
অনিমেষ পাল

বিপণন-সচিব
শুভাশিস লাহিড়ী

কম্পিউটার-সচিব
বরুণ রায়

প্রচ্ছদ
সৌজন্য চক্রবর্তী

কিশোর ভারতী
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৩৫০ ১৯৪৪

বিক্রয়কেন্দ্র
পত্রভারতী
৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫
ই-মেল patrabharati@gmail.com
ওয়েব www.bookspatrabharati.com
www.facebook.com/ Patra Bharati

*** পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন অনুমোদিত**

৩০ টাকা

KISHORE BHARATI
Vol.53 No.8 | 5 May, 2021

On behalf of
KISHORE BHARATI,
Tridib Kumar Chatterjee,
Owner, Printer & Publisher,
Published from 1/1 Brindaban
Mallick Lane, Kolkata 700 009
and printed from Hemaprabha
Printing House, 1/1 Brindaban
Mallick Lane, Kolkata 700 009.

Rs. 30.00

Editor Tridib Kumar Chatterjee

স ত্য জি ৎ ১০০

* নানা পৃষ্ঠায় সত্যজিতের অগ্রন্থিত ক্যালিগ্রাফি, অলংকরণ, চিঠি, 'সোনার কেল্লা'র হস্তাক্ষরে স্ক্রিপ্ট প্রভৃতি।

অতিথি-উপদেষ্টা **সন্দীপ রায়**
অতিথি-সহযোগী
সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
অয়ন চট্টোপাধ্যায়
সৌম্যকান্তি দত্ত
ছবি কৃতজ্ঞতা
রায়পরিবার ও আজকাল

বি. দ্র. অনিবার্য কারণে আগামী জুন ২০২১ পর্যন্ত নতুন লেখা জমা নিতে আমরা অপারগ। সকলের সহযোগিতা কাম্য।
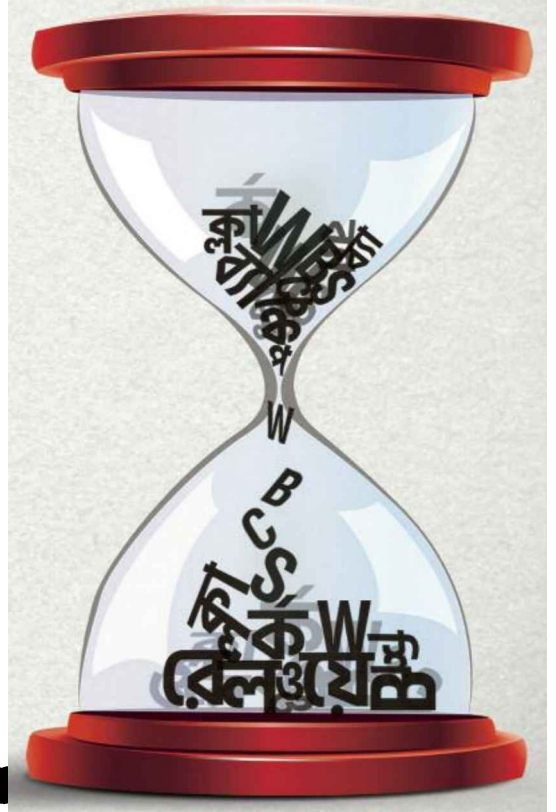
ছায়া আর নেই

প্রিয় বন্ধু,

আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক নয় এমন ঘটনাও অসহনীয় হয়ে ওঠে। যেমন, গত ২১শে এপ্রিল। ইমানুল হক সকাল সাড়ে ১১টায় ফোন করে বলল, 'দাদা, একটা খুব খারাপ খবর...একটু খবর নেবেন?' ঠিক ৫ মিনিট পরে কন্যা এষা কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, 'বাবা, শঙ্খ জেঠু...কিছু শুনেছ?'

শঙ্খ ঘোষ। নব্বই যথেষ্ট পরিণত বয়েস। তবু এই লেখা লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, স্নেহময় বটবৃক্ষ-ছায়া মাথার উপর থেকে সরে গেল, নিরাশ্রয় হয়ে পড়লাম।

আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেশিদিনের নয়। নব্বই দশকের শেষদিক থেকে শারদীয়া কিশোর ভারতীর জন্য কবিতা চাইতাম, তিনি আমাদের প্রতিনিধির কাছে দিয়ে দিতেন। দেখা হলে প্রণাম করতাম। তিনি নিচুস্বরে বলতেন, 'ভালো আছ?' এই পর্যন্ত।

২০১১ সালের আগস্ট। মোবাইলে ওঁর নাম এল, 'লেখা হয়ে গেছে।'

'দারুণ খবর! আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি দাদা।'

'না, হবে না।'

আমি হতভম্ব, 'হবে না? ক্-কেন দাদা?'

'নিজেকে আসতে হবে। আমার সামনে পড়ে তুমি মতামত দেবে।'

হে ধরণী, দ্বিধা হও! শঙ্খ ঘোষের কবিতার ভালো মন্দ বিচার করব আমি? সেই প্রথম তাঁর বাড়ি আমার যাওয়া।

সেই সূত্রপাত। তারপর কীভাবে যে দুই অসমবয়েসি মানুষের শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠল, তার সালতামামি মনে নেই আমার। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব আমায় চুম্বকের মতো টানত। বুঝতে একটুও অসুবিধে হতো না, তিনি আমায় খুব স্নেহ করেন। সেই স্নেহের পাশে গিয়ে বসলে নরম ঠান্ডা বাতাস বইত, শরীর জুড়িয়ে যেত।

তাঁর কাছে কত প্রকাশক বইয়ের জন্যে আসতেন, কত লেখক-কবি স্যারের কাছে বই দিতে, লেখা শোনাতে আসত। অনেক পরে সসংকোচে নিজের কয়েকটি বই দিয়েছি। কিন্তু পত্রভারতী যে ওঁর বই বের করতে খুবই ইচ্ছুক, সে কথা বলে উঠতে পারিনি।

স্বার্থের কথা কি বলিনি? বলেছি। যখনই বলেছি, তিনি মৃদু হেসে রাজি হয়ে গেছেন। ২০১৪ সালে অক্সফোর্ড ও পত্রভারতীর উদ্যোগে প্রথম 'বাংলা সাহিত্য উৎসব'। ওঁকে ডেকেছি, এককথায় চলে এসেছেন। ২০১৯ সালে ষষ্ঠবারের মতো এই উৎসব হয়েছিল। প্রতিবারই উদ্বোধক শঙ্খ ঘোষ। কিশোর ভারতীর বর্ণাঢ্য পঞ্চাশ বছর উদযাপন, গোর্কি সদনে। শীর্ষেন্দু, প্রফুল্ল, সমরেশ, সঞ্জীব...সকলেই উপস্থিত, সম্মাননীয় অতিথি। গানে নচিকেতা, স্বাগতালক্ষ্মী, সুরজিৎ, শিক্ষাবিদ সমিত রায়...কে নেই! আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শঙ্খ ঘোষ। এমনকী কবি লেখক শিল্পীদের নিয়ে এরপর যে নৈশভোজের আয়োজন হয়েছিল, তিনি সানন্দে চলে এলেন। কলকাতা বইমেলার যে সাহিত্য উৎসব? সেখানেও পরপর ২ বছর একমুহূর্তে সম্মতি।

স্বজনবন্ধুদের অবিরত চাপে শেষে ২০১৮ সালে বলেই ফেললাম, 'একটা বই কি পেতে পারি না?' হেসে বললেন, 'তোমার জন্যে ছোটদের একটি বই আমি তৈরি করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি একদিন বলবে। শেষে অমুক এমন করে ধরল, দিয়ে দিয়েছি।' আমি চুপ, মাথা নত। মৃদু হেসে উনি বললেন, 'দেখি। এখন তো আর কলমে লিখতে পারি না।'

দিন কেটে যায়। ২০১৯ বইমেলার মাসদুয়েক আগে ওঁর ডাকে, ঈশ্বরচন্দ্র নিবাসে গেলাম। রাজনীতি, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে কারা ভালো লিখছে...গল্প চলেছে। মোবাইলে ওঁকে ফেসবুক দেখাচ্ছি, শ্রীজাত, সুবোধ, বিনায়কের পোস্ট পড়াচ্ছি...শিশুর মতো খুশিতে তাঁর মুখ আলোকিত। খুব আস্তে আস্তে বলছেন, 'এই জীবনে কত কিছুই যে দেখে যাচ্ছি।' উঠতে উঠতে সঙ্কুচিত কণ্ঠে বললাম, 'কোনো পাণ্ডুলিপি কি...' থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার কি এখনও ইচ্ছে আছে? কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা বই মতো হয়েছে, মাসখানেক হল। তুমি তো আর কিছু বলোনি।' 'এ কী বলছেন দাদা!' 'নাও। তবে পয়লা বৈশাখ কোরো। এত অল্প সময়ে হবে না।'

অবশেষে পত্রভারতী থেকে এল তাঁর 'লেখা যখন হয় না', অভিনব বই।

২০২০-র জন্মদিন, তিনি অসুস্থ। দেখা হল না। ওমা, একটু সুস্থ হতেই সহকারী ছেলেটির ফোন, 'স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন? উনি দেখতে চাইছেন।' মুহূর্তে মন জুড়ে মনোরম বাতাস, আমি কি সৌভাগ্যবান! ফের শোয়ার ঘরে আড্ডা। উনি আধশোয়া, একটা দুটো কথা বলছেন, আমি টানা বকে যাচ্ছি।...

সেই শেষ দেখা।...এরপর কোভিড, দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। তবে ফোনে কথা হয়েছে। শারদীয়ার লেখা, সেও ফোনে। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিল ওঁর সহকারী। তার ঠিক দুদিন পরে ফোন, 'কবিতাটা চলবে?' 'আপনার কবিতা, আমি মতামত দেব?' 'হ্যাঁ, দেবে। তোমায় বলতে হবে।' কোনক্রমে বলি, 'অনবদ্য।' অস্ফুট কৌতুক, 'সত্যি বলছ? সাবধানে থেকো।'

শেষ ঘটনা আমার কাছে এখনও অলৌকিক মনে হয়। বেলভিউতে দুঃস্বপ্নের ১০ রাত কাটিয়ে সশরীরে বাড়ি ফিরেছি ১৭ অক্টোবর ২০২০। অসম্ভব দুর্বল। নভেম্বরের শুরুর এক সকালে ফোনে নাম ভেসে উঠল 'শঙ্খ ঘোষ।' সেই মৃদু কণ্ঠ, 'কেমন আছ? খবরটা পেয়েছি। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সাবধানে থাকো।' বিশ্বাস করো বন্ধু, একটাও কথা বলতে পারিনি। চোখে জল উপচে এসেছিল।

এ মানুষ কি আর পাব কোনদিন? আর কারও মধ্যে কি পাওয়া যাবে এই অপার ভালোবাসা, এই অনন্ত আশ্রয়, এই কোমল ঋজুতা, সত্যের প্রতি এই অবিচলতা? বহুকাল আমি এমন শোকাচ্ছন্ন হইনি।

অতি সাবধানে থেকো। রাজ্যের ভোটরঙ্গে যে নির্বোধ উন্মাদনা সংঘটিত হল, তার ফলে মৃত্যুমিছিল আসন্ন। বন্ধু, তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন, কিছু দিন অন্তত স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাক, মাস্ক ছাড়া থেকো না। আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝেছি, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে! আমাদের সপ্রাণ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিও।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্দীপ রায়

বাবার একশো বছর
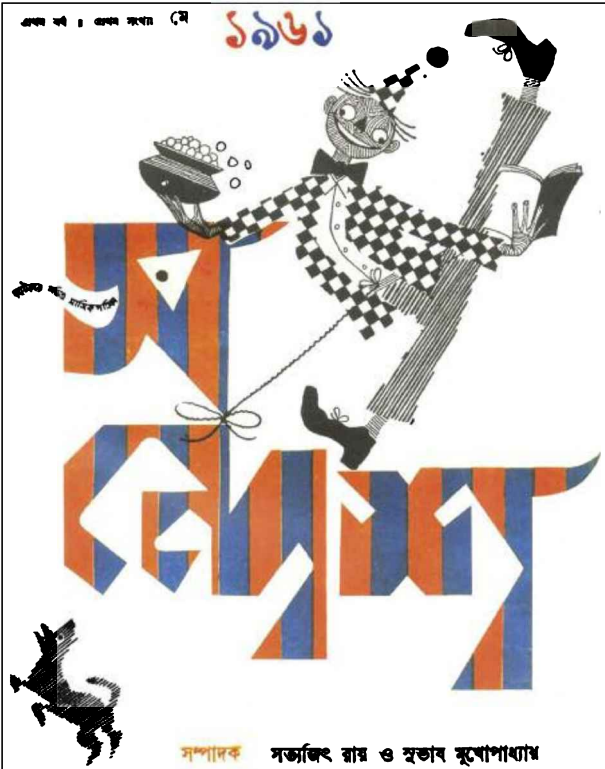
বাবার করা নবপর্যায় 'সন্দেশ'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ

খুব খারাপ একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। গোটা বিশ্বের এখন টালমাটাল অবস্থা। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই এখনও কতদিন আমাদের চলতে হবে সত্যি—জানি না। কিন্তু এসবের মধ্যেও আনন্দের খবর এই যে—এবার বাবার শতবর্ষ পূর্তি। আশা করেছিলাম, শতবর্ষের জন্মদিনটা বেশ হইহই করে কাটবে।

যদিও আমাদের রায়বাড়িতে কোনওদিনই জন্মদিন নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কিছু পরিচিত মানুষজন আসতেন—খাওয়াদাওয়া হতো, আড্ডা হতো—এভাবেই কেটে যেত।

অবিশ্যি বাবার শেষের দিকে জন্মদিনের আবহাওয়াটা একটু পালটাতে হয়েছিল, কিছুটা বাধ্য হয়েই। কারণ, তখন উনি অসুস্থ। ডাক্তারের কড়া নিষেধ কোনওরকম ভিড়ভাট্টা, কোলাহলের মধ্যে থাকা চলবে না। কাজেই ২ মে-র দিনটা বাবা হয় কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে, নয়তো আশেপাশের কোনও হোটেলে গা ঢাকা দিতেন।

আর বাবা চলে যাবার পর থেকে তো বছর বছর বাড়িতে ভিড়টা বাড়তে শুরু করল। সকাল সাতটা—সাড়ে সাতটা থেকে লোকজন আসা শুরু হয়, সেটা চলে রাত্রি সাড়ে বারোটা-একটা পর্যন্ত। চেনা-অচেনা মিশিয়ে কত লোকজন যে আসেন—তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, না এ-বছর আর সেই চেনা ভিড়টার চেহারাটা দেখা যাবে কিনা—আমি জানি না। অবিশ্যি, এটা প্রথম নয়।

গত বছর লকডাউনের মধ্যেই বাবার জন্মদিনটা পড়েছিল। স্বভাবতই সেদিনও কোনও লোকজন আসতে পারেননি। কী আর করা যাবে—সব কিছু তো আমাদের হাতে নেই।
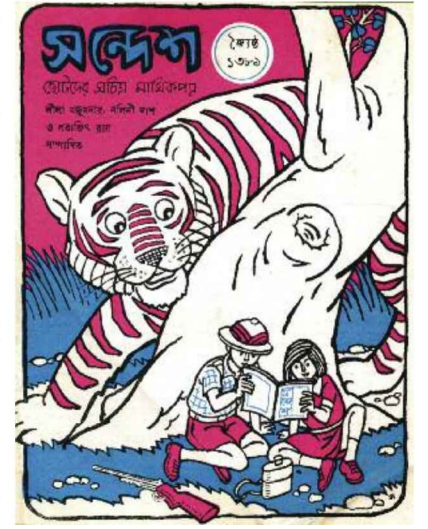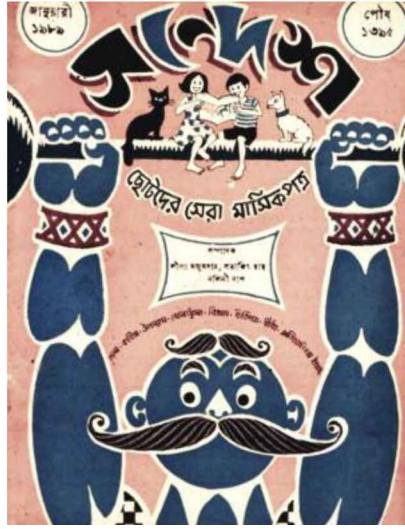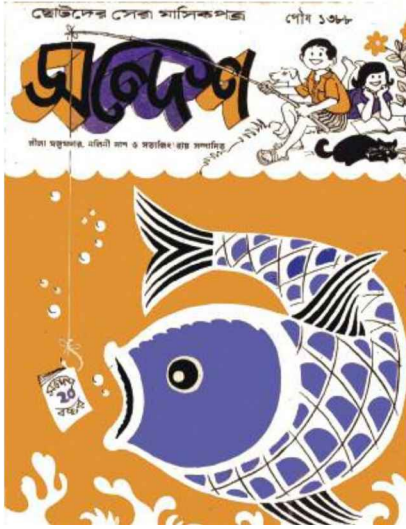
আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে দক্ষিণ কলকাতার মুদিয়ালির কাছে। প্রথমে আমরা থাকতাম লেক অ্যাভিনিউতে, তারপর চলে এলাম ৩ লেক টেম্পল রোডের ভাড়া বাড়িতে। সে বাড়ি এখনও আছে। লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে থাকাকালীন সময়েই বাবার আর সুভাষকাকার যৌথ সম্পাদনায় নব পর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ পায় ১৯৬১-র মে মাসে। আমার বয়েস তখন আট। পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরপরই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে 'সন্দেশ'-এর আবার পুনঃপ্রকাশ হচ্ছে, এবং গ্রাহক করা হচ্ছে।

মজার বিষয়, যেদিন কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরুল—সেদিনই বিকেলবেলা আমাদের বাড়িতে একজন অল্পবয়সি লোক এসে হাজির। বাবা আর সুভাষকাকা তখন নানান পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

আগন্তুকের টের পেতেই বাবার জিজ্ঞাস্য 'কী ব্যাপার?' জনৈক ভদ্রলোক বললেন, 'নমস্কার। আমার নাম দীপঙ্কর বসু। আজ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম 'সন্দেশ' আবার নতুন করে বেরুচ্ছে। আমি তার গ্রাহক হতে এসেছি।'

বাবা আর সুভাষকাকা তো থ!। সবে মাত্র, আজ বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে, এখনও গ্রাহক চাঁদার রসিদ বা কিছুই ছাপা হয়নি। এই মুহূর্তে গ্রাহক!

গোটা বিষয়টা দীপঙ্করবাবুকে খুলে বলতেই, তিনি বললেন, 'না না, তা কোনও ব্যাপার নয়। আমি এই বার্ষিক চাঁদা বাবদ ন'টাকা রেখে গেলুম। পরে ওসব রসিদ-টসিদ হবে'খন।'

এখানে বলে রাখা ভালো, এই দীপঙ্কর বসু কিন্তু রাজশেখর বসুর দৌহিত্র। কাজেই হল কী, দীপঙ্করদা হয়ে গেলেন নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকার একনম্বর গ্রাহক। আমার আর একের স্থানটায় বসা হল না। আমি হলাম দু'নম্বর গ্রাহক এবং সুভাষকাকার এক মেয়ে হলেন তিন নম্বর গ্রাহক।

তখন বাবা আর সুভাষকাকার সই করা একটা চমৎকার গ্রাহক কার্ড দেওয়া হতো 'সন্দেশী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের। পরবর্তীকালে যখন লীলুদিদা অর্থাৎ লীলা মজুমদার এবং নিনিপিসি—নলিনী দাশ বাবার সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে চলে এলেন—তখনও এই তিন সম্পাদকের সই করা গ্রাহক কার্ড নিতে ঘুণাক্ষরেও ভুলত না কোনও সন্দেশীই।

'সন্দেশ'-এর কথা এই জন্যেই বললাম, কারণ—সন্দেশ আবার নতুন
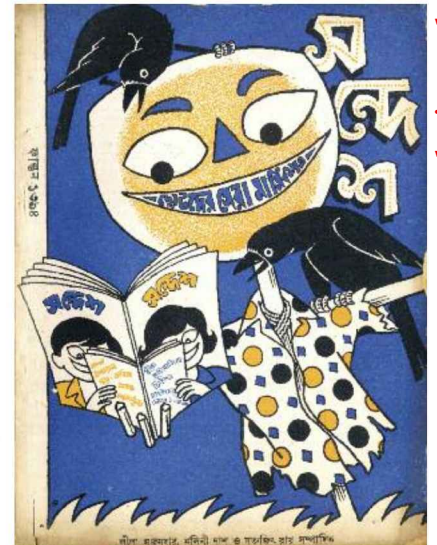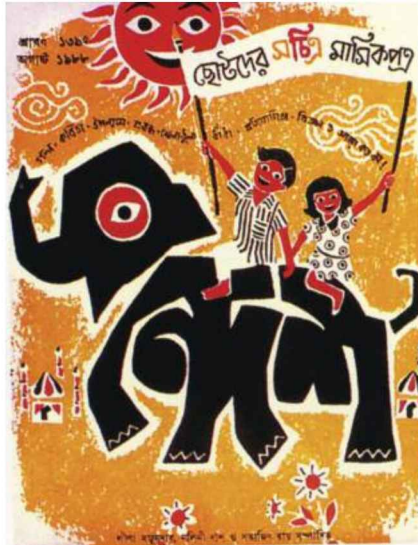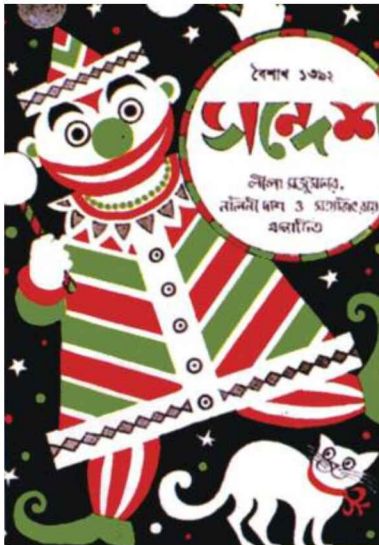
করে বেরিয়েছিল বলেই কিন্তু আমরা লেখক সত্যজিৎকে পেয়েছিলাম। সন্দেশ না থাকলে বাবা আদৌ কতটা লেখালিখি করতেন—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। আসলে 'সন্দেশ'-কে ফিড করার উদ্দেশ্যেই বাবার মূলত কলম ধরা। গোড়ার দিকে তো লুইস ক্যারল, এডোয়ার্ড লিয়রের লিমেরিক বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। তারপর তো একে একে ছোটগল্প চলে এল, আর ১৯৬১-এর শারদীয়া সন্দেশেই ধারাবাহিক ভাবে শুরু হল প্রফেসর শঙ্কুর প্রথম কাহিনী—'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরী'।

এর বছর চারেক বাদে ১৯৬৫-র ডিসেম্বর মাস থেকে পর পর তিনমাস ধরে 'সন্দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায় 'ফেলুদার

গোয়েন্দাগিরি'—ফেলুকাহিনীর সূত্রপাত তো এভাবেই। এসবের পাশাপাশি কিন্তু ওঁর নিজের লেখার জন্য ছবি আঁকা, অন্যের লেখার জন্য ছবি আঁকা ইত্যাদি চলতই। তারপর তো ফিল্মের কাজ আছেই।

আমি যে সময়টার কথা মূলত এখানে বলছি—সেটা ষাটের দশক। 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' (১৯৬১) তথ্যচিত্র থেকে শুরু করে, 'তিন কন্যা'(১৯৬১), 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২), 'অভিযান' (১৯৬২), 'মহানগর' (১৯৬৩), 'চারুলতা' (১৯৬৪), স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি—'টু' (১৯৬৪), 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' (১৯৬৫), 'নায়ক' (১৯৬৬), 'চিড়িয়াখানা' (১৯৬৭), 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' (১৯৬৯)—একের-পর-এক ছবি করছেন বাবা।

এই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির কথা বিশেষ করে বলতে হয়। সেই সময় এ-ছবির বাজেট ছিল সাড়ে ছ' লক্ষ টাকা। ছবিটার প্রযোজক ছিলেন 'প্রিয়া সিনেমা'-র নেপাল দত্ত। আসলে ওঁদের বাড়ির স্ত্রী পূর্ণিমাদির ছেলেমেয়েরা তখন খুবই ছোট। মূলত তাঁদের কথা ভেবেই ওঁরা এত বড় বাজেটের ছবির প্রযোজনার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

তাছাড়া, আমার একটা ক্রমাগত আবদার চলতই বাবার কাছে, 'কেন ছোটদের জন্য ছবি করছ না?' সেই তাগিদ অনুভব করেই বাবা তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প অবলম্বনেই ছবি করলেন। যে ছবি আজ ইতিহাস। সত্যি বলতে কী, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মতো ছবির কথা ভাবতেই অবাক লাগে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ওই ধরনের ছবি করাটা একপ্রকার প্রায় অসম্ভব।

ইচ্ছে ছিল—বাবার শতবর্ষ উপলক্ষে বেশ কিছু এগজিবিশন ইত্যাদি করবার। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটা আদৌ কতটা সম্ভব—সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে, এখনই আশা ছাড়ছি না। ইদানীং ইন্টারনেটের দৌলতে অনলাইনে অনেক আলোচনা ইত্যাদি হচ্ছে—কিন্তু সেটা অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ব্যাপার।

তবে, এখন সময় এসেছে আট থেকে আশি সব বয়সের মানুষেরই বাবার কাজগুলোকে নতুন করে জানার, বোঝার। সেটাই তো তাঁকে শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে বড় উপায়। এর বেশি এ মুহূর্তে আমার তো আর কোনও হিল্লে হতে পারে বলে মনে হয় না। কিশোর ভারতী

বাবার করা 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবির বিজ্ঞাপন।

অন্যের গল্পে সত্যজিতের হেডপিস

তুষার মানবের সন্ধানে—প্রভাতরঞ্জন রায়। ছবি সত্যজিৎ রায়

দানের হিসাব—সুকুমার রায়। ছবি সত্যজিৎ রায়
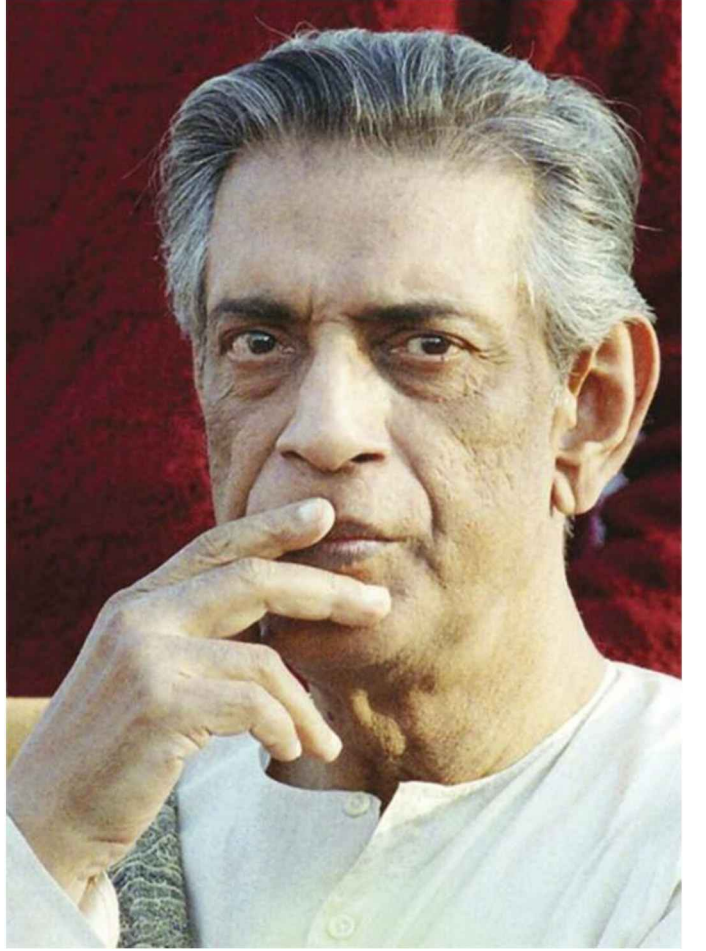
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ

বন্ধু, অতি সম্প্রতি বাঙালী হিসেবে আমাদের পরম গর্বিত হবার মতো একাধিক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেলো। ঘটেছে একজন মানুষকেই কেন্দ্র করে। তাঁর নাম—সত্যজিৎ রায়।

চলচ্চিত্রে সমগ্র জীবনব্যাপী অসামান্য অবদানের জন্য সত্যজিৎ রায় ভূষিত হলেন পৃথিবীর সব সেরা 'অস্কার' পুরস্কারে। এশিয়া মহাদেশে একমাত্র জাপানি পরিচালক কুরোশওয়া ছাড়া কেউই পাইনি এই দুর্লভ সম্মান। ইতিপূর্বে 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে অদ্যাবধি দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে এহেন পুরস্কার নেই, যা সত্যজিৎ পান নি। এমনকি বছর দুয়েক আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং কলকাতায় এসে তাঁকে সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার'-এও সম্মানিত করে গেছেন।

'অস্কার' প্রাপ্তির পরপরই আমাদের ভারত সরকার সত্যজিৎ রায়কে জানালেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন'। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে তাঁকে এই সম্মান জানিয়ে গেলেন। সাধারণতঃ প্রজাতন্ত্র দিবসে এইসব সরকারী সম্মান ও পদক দেওয়া হয়। সত্যজিতের ক্ষেত্রে এই প্রথা ভাঙা হলো।

এই আনন্দ ও গর্বের মুহূর্তে আমাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কাও কম নয়। শারদ-উৎসবের আগে থেকেই সত্যজিৎ রায় তেমন সুস্থ ছিলেন না। তারপর ভর্তি হয়েছিলেন নার্সিহোমে। হৃদযন্ত্রে গোলযোগ, শ্বাসকষ্ট বহুবিধ উপসর্গ। এখনও, বেশ কিছুদিন ধরে সত্যজিৎ নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

আসলে শুধু তো চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নয়, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা বহুধাবিস্তৃত। চলচ্চিত্রের কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ এমনকি সঙ্গীত, সেখানেও সত্যজিৎ রায়। তাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া-কবিতা সবরকম লেখাতেই তিনি স্বছন্দ। আর শিল্পকলা অর্থাৎ ছবি আঁকা? সেখানে সেরা শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর নাম একযোগে উচ্চারিত।

এই বিরল প্রতিভাবান মানুষটির এমনসব সম্মান প্রাপ্তিতে আমরাও তাই গর্বিত, আনন্দিত। মনেপ্রাণে কামনা করি, সুস্থ হয়ে উঠুন সত্যজিৎ রায়। তার অবিরাম সৃজনশীল কর্মযজ্ঞে আরও, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক চলচ্চিত্র, শিল্প ও সাহিত্য।

সম্পাদকীয়

কিশোর ভারতী এপ্রিল ১৯৯২
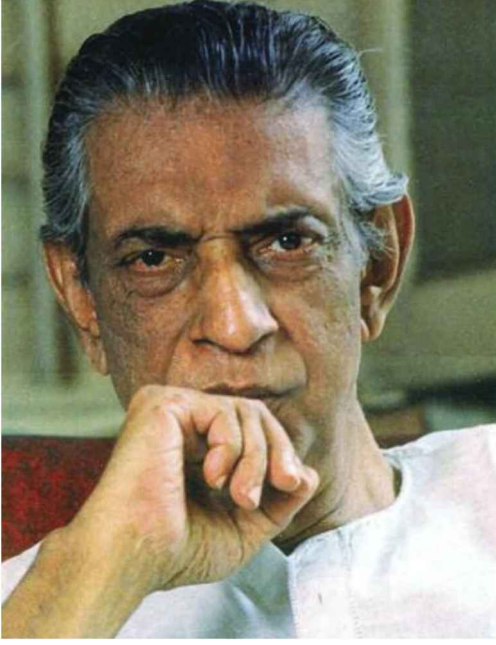
স্নেহের বন্ধুগণ, মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে এবারের সম্পাদকীয়। গত এপ্রিল সংখ্যাতেই যে বরেণ্য মানুষটির দুর্লভ সব সম্মান ও পুরস্কার প্রাপ্তিতে বাঙালী তথা ভারতীয় হিসেবে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম এবং মনেপ্রাণে কামনা করেছিলাম তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা, সেই সত্যজিৎ রায় চলে গেলেন।

রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরা এই জগৎ, যা ফুটে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি সৃষ্টিতেই, সেই জগৎ থেকেই তিনি বিদায় নিলেন গত ২৩শে এপ্রিল। বিদায়লগ্ন ছিলো গোধূলিবেলা, যখন আকাশ ভরে ওঠে রামধনু রঙে, পাখ পাখালি ফিরে আসে নীড়ে। সত্যজিৎ চলে গেলেন হাসি কান্না আনন্দ-বেদনায় ভরা নীড় ছেড়ে। চিরদিনের মতো।

তবে বাস্তব অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে এই বেদনা আমাদের অপ্রত্যাশিত ছিল না। এপ্রিল মাসের গোড়া থেকেই সত্যজিৎ রায়ের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছিল, শেষের কদিন তো কেটেছে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায়। তবুও সকলেরই মন দুলছিল ক্ষীণ আশায়—যদি আশ্চর্য কিছু ঘটে যায়, যদি অসম্ভব জীবনীশক্তি আবার সত্যজিৎকে ফিরিয়ে আনে সুস্থতার দিকে। তা আর হলো না।

অথচ গত ২৯ শে জানুয়ারি নিয়মিত চেক আপের জন্যই সত্যজিৎ ভর্তি হয়েছিলেন নার্সিংহোমে। পরবর্তী ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তৈরি করে। ফিরে এসেই, কথা ছিল, নতুন ছবিতে হাত দেবার। কাজটি অসমাপ্তই রয়ে গেলো।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৯২১ সালের ২রা মে তাঁর জন্ম। তাঁর অতি শৈশবেই, মাত্র আড়াই বছর বয়েসের সময় দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিদায় নিলেন বাবা সুকুমার রায়, রেখায় ও লেখায় বাংলা শিশুসাহিত্যে যাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। পিতামহ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যিনি একাধারে ছিলেন শিশুসাহিত্যের পথিকৃত, অন্যদিকে মুদ্রণ ও হাফটোন ব্লকের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক। সত্যজিৎ-এর কাকা পিসি ও ঠাকুর্দারাও ছিলেন সেকালের শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে এক একজন দিক্‌পাল। সব মিলিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মসূয়ার রায় পরিবারের তুলনা চলে একমাত্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেই।

পিতৃহারা শিশু সত্যজিৎ একমাত্র অবলম্বন মায়ের স্নেহচ্ছায়াতে বেড়ে উঠতে থাকেন। ঐ সময় মা সুপ্রভা দেবী একমাত্র সন্তানকে মানুষ করার জন্য একাকিনী যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা অবিস্মরণীয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে প্রবেশের পর থেকেই ঘটতে থাকে সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ। ছবি আঁকার জগৎ থেকে চলচ্চিত্রের জগৎ, সঙ্গীত জগৎ, সাহিত্যের অঙ্গন যেখানেই পা ফেলেছেন দীর্ঘদেহী এই মানুষটি, সাফল্য ও সম্মান এসেছে প্রত্যাশিতভাবে।

সর্বোপরি চলচ্চিত্র জগতের মাধ্যমে তিনিই ছিলেন শেষ বাঙালী, যাঁর নাম সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো। রবীন্দ্রনাথের মতো না হলেও বহুমুখী প্রতিভার দীপ্তিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগে সত্যজিৎ-ই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বঙ্গসন্তান।

তাই আজ আমাদের সত্যিই বড় শোকের দিন, ব্যথার দিন। আমরা গভীর শোকাহত। আমরা প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের সমব্যথী, সহমর্মী।

আজ এখানেই শেষ করছি। তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও স্নেহাশিস গ্রহণ করো। ইতি—

চিরশুভার্থী
তোমাদের সম্পাদক বন্ধু।

সম্পাদকীয়
কিশোর ভারতী মে ১৯৯২

অন্যের গল্পে সত্যজিতের হেডপিস

কালোমানিক—গৌরী চৌধুরী। ছবি সত্যজিৎ রায়

এই বাঘটাই সেই বাঘটা-ই—বিশ্বপ্রিয়। ছবি সত্যজিৎ রায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

খুব রহস্যময় এবং আকর্ষক

সত্যজিৎ রায়কে আমি প্রথম দেখি যখন আমি সিটি কলেজে পড়ি, বিএ ক্লাসে। সে সময় আমাদের কলেজে এক রবিবার সত্যজিৎ রায় আসেন 'অপরাজিত' ছবির শুটিং করতে।

তখন ওই শুটিং দেখার কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আমাদের মাস্টারমশাই দেবুবাবু, আমাদের বলে রেখেছিলেন যে, কালকে সত্যজিৎবাবু শুটিং করতে আসবেন। 'পথের পাঁচালী' রিলিজ করেছে, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। তাঁর দ্বিতীয় ছবির শুটিং করতে আসবেন। তোমরা সবাই আসবে। লাস্ট সিনে তোমাদের থাকতে হবে।

আমরা সবাই জামাকাপড় পরে, চুলটুল আঁচড়ে সকালে গিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। সেখানে দেখলাম, তাঁর ইউনিট নিয়ে তিনি এসেছেন। বিশাল লম্বা মানুষ। খুব ম্যানলি হ্যান্ডসাম, রাফটাফ গোছের। বড় বড় চোখ। খুব সুন্দর চেহারা।

দৃশ্যের পর দৃশ্য উনি তুলছেন। শুটিং জিনিসটা যে এত একঘেয়ে হয় সেটা জানা ছিল না। সেই প্রথম জানলাম। শুটিং হয়ে যাবার পর উনি চলে গেলেন। আমরা ব্যাপারটা নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলাম।

তারপর দীর্ঘ সময় ধরে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার নেই। তিনি আমাকে চেনেন না, আমি তাঁকে দূর থেকে চিনি এই পর্যন্ত। কোনো সম্পর্ক নেই, কিছু নেই।

দীর্ঘদিন পরে, আমি যখন একটু আধটু লেখালিখি করছি, হেরে যাওয়া একজন মানুষের উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলছে, সেইসময় আমার জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমি আনন্দ পুরস্কার পেলাম।

এই আনন্দ পুরস্কার পাবার ঘটনাটি খুব স্মরণযোগ্য। সেই পুরস্কার

পেয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ সেবারই আনন্দ পুরস্কার খুব জাঁকজমক করে দেওয়া হয়েছিল, পুরস্কারের অর্থমূল্য অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জাঁকজমক বলতে পুরস্কারের দিন আমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন ছিল ক্যালকাটা ক্লাবে। আনন্দবাজার থেকে বলা হল, আমাকে লাঞ্চে যেতে হবে এবং সেখান থেকে পুরস্কার নিতে যেতে হবে পার্ক হোটেলে।

ক্যালকাটা ক্লাবে গিয়ে দেখি, সেখানে একেবারে নক্ষত্রের হাট। কে নেই সেখানে! অশোককুমার সরকার, বুদ্ধদেব বসু, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে শুরু করে আরও জ্ঞানী-গুণি মানুষে ভর্তি একেবারে। তারকা-খচিত যাকে বলে। আমি তো সে মানে, ভয়ে সংকোচে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে একটা সোফার এক কোণে বসে আছি। আমার সামনে বুদ্ধদেব বসু। তিনি আমাকে একটু চিনতেন। খুব ভালো পরিচয় ছিল না। তিনি আমার সঙ্গে একটু আলাপ করলেন। আমাকে বললেন, 'তুমি নাকি এক সাধুর শিষ্য হয়েছ!'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হয়েছি।'

উনি বললেন, 'ভালো ভালো।'

হঠাৎ সত্যজিৎবাবু ঠিক আমার পাশে এসে বসলেন। একদম আমার গা ঘেঁষে ডান পাশে। তাঁর সঙ্গে কেউ আমার পরিচয় করিয়ে দেয়নি, তিনি নিজে থেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের এবং আনন্দের কথা যে, তিনি আমার লেখার রেফারেন্সে কথা বলতে শুরু করলেন। সেই উত্তরের ব্যালকনি ইত্যাদি নানা রকম রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি মনোজ মিত্রের "চাক ভাঙা মধু" নাটকটা দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'নাটক দেখিনি, তবে উপন্যাসটা পড়েছি। আমার খুব ভালো লেগেছে।'

এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলল। তারপর নানান প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আমার সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন। আর কারুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। নিজের কথা বললেন, সিনেমার কথা বললেন। আমি তো বেশি কথা বলতে পারি না। আর অত বড় মানুষ, তাকে বলার মতো আমার তো বেশি কথাও নেই। তাই চুপ করে বসে রইলাম।

এরপর সত্যজিৎবাবুর একটা অনুষ্ঠানে আমি গেছি। সন্দেশের অনুষ্ঠান। সেখানে আমাকে বলা হল যে, আপনি একটা গল্প পড়ে শোনান। আমাকে আগে থেকেই বলে রাখা হয়েছিল, আমি গল্পটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা সন্দেশেরই গল্প। কোনো একটা সংখ্যায় বেরিয়েছিল। পড়লাম।

সত্যজিৎবাবু সেটা শুনলেন। আমাকে বললেন, 'এই গল্পটা পুজো সংখ্যা সন্দেশের জন্য আমাকে দিন না।'

আমি হেসে বললাম, 'এটা তো আপনারই কাগজে বেরোনো গল্প। এটা আর আপনি ছাপবেন কী করে?'

শুনে উনি হেসে উঠলেন। এইরকম সব মজার ব্যাপারট্যাপার হল সেদিন।

আরেকবার মনে আছে, সম্ভবত বাবুই মানে সাগরময় ঘোষের ছেলের বিয়ে। সেটা হয়েছিল সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালের প্রাঙ্গণে। আমার মেয়ে তখন খুব ছোট। ওকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানেও সত্যজিৎবাবু এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন।

আমি দেখতাম, উনি আমাকে পছন্দ করতেন। আমাকে বললেন, 'এটি কে?'

বললাম, 'আমার মেয়ে।'

উনি মেয়েকে আদর করলেন। মেয়ে তো হাঁ করে অত লম্বা মানুষটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর অনেক কথা বললেন। সেসব কথা আজ আর মনে নেই।

প্রত্যেকবার পুজোর আগে উনি আমাকে সন্দেশের জন্য গল্প চেয়ে চিঠি দিতেন। নিজের হাতে 'প্রিয়বরেষু' বলে অল্প কথায় লেখা চিঠি পাঠাতেন।

সেই চিঠিগুলো সব যত্ন করে রেখেছিলাম! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, বাসা বদল করতে করতে অনেক মূল্যবান চিঠি আমি হারিয়ে ফেলেছি। সত্যজিৎবাবুর কোনো চিঠিই আর এখন আমার কাছে নেই। সেগুলো হারিয়ে ফেলা খুবই দুঃখের ব্যাপার আমার কাছে।

যাইহোক, ওঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ না হলেও একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আমি একটু আত্মগত জীবন যাপন করি, বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি মিশতে পারি না। আমি ভালো talker নই, ভালো কথা বলতে পারি না। অনেকে যেমন নানারকম প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথা বলে যেতে পারেন, আমি তা পারি না। সেটা আমার একটা মস্তবড় ড্রব্যাক বলা যেতে পারে।

আর একবার মনে আছে, সেটাও একটা লাঞ্চের নেমন্তন্ন। সেটাও ছিল আনন্দ পাবলিশার্সেরই একটা অনুষ্ঠান, বেঙ্গল ক্লাবে। সেখানে গেছি। সেইখানেও সত্যজিৎবাবু আমার পাশে এসে বসলেন। আমার ডানদিকে সত্যজিৎবাবু, বাঁদিকেও নামকরা কেউ একজন ছিলেন, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। সত্যজিৎবাবু অনেক কথা বলতে লাগলেন। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। আমি যেহেতু ভালো

অন্যের গল্পে সত্যজিতের হেডপিস

বুড়ো বাপের তিন ছেলে—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি সত্যজিৎ রায়

মায়াবন্দরের ঐরাবত—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি সত্যজিৎ রায়

কথা বলতে পারি না, তাই শুনছি। বুঝতে পারছি, উনি আমাকে বেশ পছন্দ করেন। আমার সেটা খুব ভালোও লাগত।

এর পরের ঘটনা হল, আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ আমাকে বলল, সত্যজিৎ রায়ের একটা ইন্টারভিউ নিতে। আমি বললাম যে, ঠিক আছে নেব। কোনো অসুবিধে নেই, আমার সঙ্গে তো মোটামুটি ভালোই আলাপ আছে। বাদল বলল, আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

বাদল আমাকে নিয়ে গেল বিশপ লেফ্রয় রোডে সত্যজিৎবাবুর বাড়িতে। সে সময়ে আমার চোখে একটা ইনফেকশন হয়েছিল। তাই একটু সতর্ক থাকতে হয়েছিল। তাতে সত্যজিৎবাবু অবশ্য কিছু মাইন্ড করলেন না।

বসবার ঘরে বসলাম। চা-টা সব এল। উনি খুব খুশি হলেন আমাকে দেখে। আমাকে যে উনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন, সেটা বেশ বোঝা যেত। যদিও আমার কোনো গল্প- উপন্যাস নিয়ে উনি ছবি করেননি, তবে মন দিয়ে আমার লেখা পড়তেন এবং মতামত দিতেন।

তা আমি একের পর এক প্রশ্ন করলাম উনি জবাব দিলেন। সে সাক্ষাৎকার আনন্দবাজারে প্রকাশিতও হয়েছিল। সেখানে সত্যজিৎবাবুর আধ্যাত্মিকতা নিয়েও আমার প্রশ্ন ছিল। তাতে উনি বললেন, 'আপনি আমার "দেবী" ছবিটা দেখবেন। সেখানে আমার লাইফ ফিলজফি খানিকটা বুঝতে পারবেন।'

সত্যজিৎবাবুর শেষের দিকের কয়েকটা ছবি দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন অতটা ব্রিলিয়ান্স নেই। যেমন, গণশত্রু। আমাদের দেশে তো কুসংস্কার বিরোধী অনেক প্রসঙ্গ ছিল। সেসব বাদ দিয়ে একটা বিদেশি প্লট কেন নিলেন, ওটা তো বিদেশি গল্পের অ্যাডাপ্টেশন, সেটা আমার কাছে খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি। শাখা-প্রশাখা অবশ্য বেশ ভালো লেগেছিল।

এটাই সম্ভবত ওঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার। তার পর আমাদের আর দেখা হয়নি। যদ্দুর মনে হয়, আর দেখা হয়নি। এক-আধবার যদি হয়েও থাকে তা তেমন স্মরণযোগ্য নয়। তবে ওঁর সঙ্গে যে অনেকবার দেখা হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এর বেশ কিছুদিন পর সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হল। তখনও আমি আনন্দবাজারে চাকরি করি। সে সময় হঠাৎ একদিন বাদল আমাকে ফোন করে বলল, 'সত্যজিৎবাবু আপনাকে একটা কথা বলতে বলেছেন, বার্তাবাহী হিসেবে আমি বলছি, সন্দেশের যে শারদীয়া সংখ্যা বেরবে, তার জন্য উনি আপনার একটা গল্প চান।'

কাজের খুব চাপ! তাও আমি বললাম, 'সত্যজিৎবাবু চেয়েছেন, আমি নিশ্চয়ই দেব।'

আমি একটা গল্প লিখলাম। গল্পটার নাম 'পটকান যখন পটকালো'। সত্যজিৎবাবু নিজে তার ছবি আঁকলেন এবং বলে পাঠালেন যে, গল্পটা তাঁর অসম্ভব ভালো লেগেছে। আমি শুনেছি যে, উনি সাগরদাকে (সাগরময় ঘোষ) বেশ কয়েকবার ফোন করে আমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই ছেলেটির ওপর নজর রাখবে।'

এই একই কথা কিন্তু বুদ্ধদেব বসু সাগরদাকে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন। এ আমার মস্ত সৌভাগ্য। জীবনের সবথেকে বড় পুরস্কার! এঁরা বিচক্ষণ সাহিত্য বোদ্ধা, তাঁদের কথার অনেক দাম। আমি নিজেকে যতটা তুচ্ছ ভাবি, তাচ্ছিল্য করি, এঁরা হয়তো সেটা ভাবেন না। এটাই আমার মস্ত বড় সান্ত্বনার কথা।

ঘটনাক্রমে সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভালোরকমই ভাবসাব হয়ে গেল। উনি অনেক অনুষ্ঠানে আমাকে ডাকতেন। আর একটা ব্যাপার করলেন। সেটা হচ্ছে, আমরা কয়েকজন, সুনীল, শংকর, আমি এবং আরও কয়েকজনকে তিনি নিয়মিত তাঁর নতুন ছবির প্রেস রিলিজে আমন্ত্রণ জানাতেন। বিশেষ অতিথিরাও সেখানে ছবি দেখতে যেতেন। এই সম্মান তিনি বরাবর আমাদের সবাইকে দিয়ে গেছেন।

উনি হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ছবি দেখে বেরোলেই জিগ্যেস করতেন, কেমন লাগল।

উনি যে আমার লেখার সম্পর্কে যথেষ্ট খবরাখবর রাখতেন সেটা বুঝতে পারতাম এবং আনন্দিত হতাম। একটা কথা উনি প্রায়শই আমাকে বলতেন, 'আমি কিন্তু বেসিকালি ফিল্ম মেকার।' ওঁর যেমন একটা শিল্পী সত্ত্বা আছে, একটা লেখক সত্ত্বাও আছে। লেখক হিসেবে তো অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রথম তিন-চার জনের মধ্যে পড়েন উনি। কিন্তু উনি ওঁর লেখক সত্ত্বাকে অতটা প্রমিনেন্স দেননি।

ওঁর কথা অনুযায়ী, 'মুখ্যত আমি শিল্পী নই, লেখকও নই। মুখ্যত আমি ফিল্ম মেকার। সেই জন্যই আমি এই জায়গায় এসেছি।'

আমি ওঁর লেখার প্রসঙ্গ বারবার তুলেছি। সেগুলোকে পাশে সরিয়ে রেখে উনি ফিল্ম মেকিং-এর প্রসঙ্গেই ফিরে গেছেন।

ওঁর ফিলজফিটা আমি অনেকভাবে জানার চেষ্টা করেছিলাম। জিগ্যেস করেছিলাম, 'আপনি আস্তিক না নাস্তিক?' এই প্রশ্নের জবাব উনি একটু ভাসাভাসা রকম দিয়েছিলেন। আস্তিকও নন, নাস্তিকও নন, এরকম একটা মাঝপথে উনি ছিলেন বলে মনে হয়েছে।

সব মিলিয়ে-মিশিয়ে ওঁর ব্যক্তিত্ব আমার কাছে খুব রহস্যময় এবং আকর্ষক। চমৎকার একজন মানুষ! আর এত পণ্ডিত ছিলেন! শুনেছি, উনি ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, রাগ সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত গুলে খেয়েছেন। গান-বাজনা উনি এত ভালো জানতেন, এত ভালো বুঝতেন! সাহিত্যবোধও ছিল সাংঘাতিক। সবদিক থেকে চৌকস একজন মানুষ।

ওঁর প্রয়াণে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। মনে হল, এত বিশাল প্রতিভার সবটা বোধহয় বিকশিত হতে পারল না, তার আগেই অস্তমিত হয়ে গেল। কিশোর ভারতী

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়

তখন আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের আর্ট ডিপার্টমেন্টে বসে তৎকালীন সাপ্তাহিক, পত্রিকা ও খবরের কাগজের জন্য ছবি এঁকে চলেছি পুরোদমে। দেশ, আনন্দমেলা, আনন্দলোক (পূজাসংখ্যা), সানন্দা, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, সানডে, হিন্দি পত্রিকা রবিবার, আনন্দবাজার, দ্য টেলিগ্রাফ—যাবতীয় কাগজে মনের আনন্দে ছবি আঁকতাম। ইলাস্ট্রেশন, আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকতাম এই কথা মনে রেখে যে সেইসব কাজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেন তাদের আনন্দ দিতে পারে। দেশ-বিদেশ জুড়ে সমস্ত পাঠকের হৃদয় যেন জয় করতে পারি, সেই অদম্য ইচ্ছা নিয়েই ছবি এঁকেছি আজীবন। আর্ট কলেজে পেন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে যখন চাকরিতে ঢুকি, তখন আনন্দবাজারের সমস্ত কাজই আমার ক্যানভাস ওয়ার্ক বলে মনে করতাম। আর আমাদের আঁকা ছবি, ইলাস্ট্রেশন, প্রচ্ছদ—এই সবকিছু যিনি প্রায়ই দেখতেন তিনি হলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। সেই সব কাজ নিয়ে মন্তব্যও করতেন। আর আমার মতো উঠতি শিল্পীর কাছে তা ছিল অত্যন্ত গর্বের।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা একাধিকবার সত্যজিৎ রায়ের অরিজিনাল কাজও দেখেছি। ফেলুদা সিরিজের ছবি, প্রফেসর শঙ্কু, তারিণীখুড়োর বিভিন্ন গল্পের ছবিগুলো প্রায়ই আনন্দবাজারে আসতে দেখতাম। মনে আছে, অনেক সময় উনি ব্রোমাইড পেপারে কোনো সিনেমার স্টিল ফোটোর পিছনদিকে ছবি এঁকে পাঠাতেন। কোনোটা উল্টে দেখলাম হয়তো 'চারুলতা'-র স্টিল ফোটো। ওঁর এরকমভাবে আঁকার কারণ আসলে ব্রোমাইড পেপারের উল্টোদিকে যে খসখসে সুন্দর গ্রেন থাকে তার উপর রঙ ধরে ভালো। ওঁর সমস্ত লেখার সঙ্গে ছবিগুলোর সাবলীলতা দেখে অভিভূত হতাম। স্বচ্ছন্দে আঁকা ছবিগুলো যেন পরিপূর্ণতায় ভরপুর। অসাধারণ কম্পোজিশন, সাদা-কালোর অতুলনীয় বিভাজন এবং সামান্য কয়েকটি রঙের ব্যবহারে হাজার রঙের সমাহার আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। কতটুকু কাজ করতে হয় আর কোন জায়গায় এসে ছেড়ে দিতে হয় বা বাড়তি কিছু করতে নেই, সেটা যেকোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রেই একমাত্র সত্যজিৎ রায়-ই শিখিয়ে গিয়েছেন।

ওঁর সিনেমাতেও দেখতাম কী অসাধারণ আলোছায়ার মাধুর্য ও মাদকতার আবেশ প্রতিটা কম্পোজিশন, প্রত্যেক চলমান এবং স্থির শটে। প্রতিটা শট যেন যামিনী রায়ের তুলির টানের মতো—শুরু আর শেষের মধ্যে একটা গতি কাজ করছে, বিচ্যুতির কোনো চিহ্নমাত্র নেই। সাবলীলতায় ভরা একটা মাস্টার পেন্টিং-এর মতো।

তখন আমি স্কুলে পড়ি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' দেখে ফেলেছি বেশ কয়েকবার। আমাদের প্রজন্মের আরও অনেকের মতো সেই সিনেমার প্রতিটা গান ও ডায়লগ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আমারও। রাজা রাজবল্লভ পাড়ার সীতাকান্ত ব্যানার্জী লেনের বাড়িতে আমার শৈশব কেটেছে

মূলতঃ ছবি আঁকা এবং মূর্তি গড়ার মহানন্দে। সেই সঙ্গে যাত্রাপালা, নাটক, তরজা গান শোনা, কুমারটুলির ঠাকুর গড়া, গঙ্গাপাড়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো তো রয়েছেই। সেই সময় একদিন আমরা পাড়ার ছেলে ছোকরা মিলে ঠিক করলাম 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' সিনেমা থেকে নাটক করব। আমাদের প্রতিবেশী ভোলানাথ ভট্টাচার্য দারুণ ঢোল বাজাত আর সোমনাথ গুপ্ত গাইত গান। তাদেরকেই যথাক্রমে বাঘা এবং গুপী চরিত্রের জন্য বাছা হল। দুজনকে মানিয়েছিলও বেশ। ছাদে বেশ অনেকদিন রিহার্সাল করে অবশেষে নাটকটা মঞ্চস্থ করেছিলাম আমরা। গোটা নাটকের সেট, লাইট থেকে চরিত্রগুলোর পোশাক সবই তৈরী করেছিলাম আমি। নাটকটা পাড়ায় বেশ সমাদৃত হয়েছিল, এমনকি বেশ কিছু বড়দের ক্লাব থেকে অফারও এসেছিল সেটা করার জন্য। কিন্তু পরে আর করা হয়নি।

এইবার আসি আসল কথায়। সত্যজিৎ রায়ের আঁকাগুলোর একটা ব্যাপার আমায় ভীষণভাবে অবাক করত সেগুলো ছেপে আসার পর। সেখান থেকেই তাঁর প্রিন্টিং টেকনোলজি সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ছাপার কোয়ালিটি এবং টেকনোলজির প্রেক্ষিতে কতটুকু কাজ করা প্রয়োজন, সেটা আজীবন শেখার চেষ্টা করে গিয়েছি ওঁর কাজ দেখে। আমার মনে হয় সেটা যে-কোনো শিল্পীর কাছেই একটা শিক্ষণীয় বিষয়।

আমার শিল্পীজীবনের অন্যতম স্মরণীয় একটি ঘটনা হল সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি কবিতার জন্য ছবি আঁকা। সেটা ছাপা হয়েছিল আনন্দমেলার পূজাসংখ্যায়। তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমার হাতে লেখাটা দিয়ে বলেছিলেন, 'শোনো সুব্রত, এটা কিন্তু গুপী-বাঘা সম্পর্কিত একটি কবিতা। ওই চরিত্রগুলো নিয়েই ছবি হবে।' পড়ে দেখলাম জগদ্বিখ্যাত 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'। তার আগে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর শেষ দৃশ্য ছাড়া গুপী ও বাঘাকে রঙিন পোশাকে দেখিনি কখনও। মনোযোগ দিয়ে নিজের মতো করে রঙ দিয়ে গুপী-বাঘার সেই আনন্দে ভরা মুক্ত আকাশের নীচে ছবিটা আঁকলাম। তাদের ভবঘুরে মুক্তমনের অভিব্যক্তির ছবিটা ফুটিয়ে গোটা ছবিটাতেই আনন্দের মুডটাকে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর যখন 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমায় সেই গান শুনলাম ও দেখলাম, সে মুগ্ধতা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনি আজও। সত্যজিৎ রায় বাদলদাকে বলেছিলেন ছবিটিতে পোশাকে রঙের ব্যবহার ওঁর খুব ভালো লেগেছে।

এরপর একদিন আমার আর এক প্রিয় সাহিত্যিক শ্রী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সত্যজিৎ রায় ও অন্যান্য' বইয়ের জন্য ওঁর একটি পোর্ট্রেট এঁকে দিতে বলেছিলেন। ভীষণ উৎসাহ ও নিষ্ঠা সহকারে এঁকেছিলাম পোর্ট্রেটটা। মুখে পাইপ নিয়ে গভীর ভাবনায় মগ্ন সত্যজিৎ রায়ের সেই পোর্ট্রেটটা এঁকেছিলাম অয়েল পেন্টিং ট্রিটমেন্টে। পরে রঞ্জনদার কাছে শুনেছিলাম, যখন বইটি ওঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সেই মোড়কটি খুলেই উনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কে এঁকেছে?' তারপর পাশে আমার সইটা দেখে বলে ওঠেন, 'ওহ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন! অপূর্ব হয়েছে কাজটা।' ওই মাপের একজন শিল্পীর কাছে এমন প্রশংসা লাভ আমার কাছে যে-কোনো অ্যাওয়ার্ডের সমতুল্য বলে মনে করি।

আমার গোটা শিল্পীজীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা এবং আমার মতে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টটা ঘটেছিল এর কিছুকাল পরেই। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী সাগরময় ঘোষ (সাগরদা) একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন ওঁর ঘরে। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে ডাকতেন। তেমনই সেদিনও ডেকেছিলেন—এমনটাই মনে হয়েছিল স্বভাবতঃ। গেলাম ওঁর ঘরে। আমাকে দেখেই সামনের চেয়ারে বসতে বলে একটুও সময় নষ্ট না করে সোজা ঢুকে পড়লেন আসল কথায়। বললেন, 'সুব্রত, তুমি তো জানোই সত্যজিৎ রায় এখন আর ছবি আঁকতে পারছেন না শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তাই এইবার উনি ফেলুদার উপন্যাস পাঠিয়েছেন ইলাস্ট্রেশন ছাড়া। সঙ্গে বলেছেন, "এখন থেকে আমার সমস্ত গল্প-উপন্যাসের ছবি আঁকবে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কারণ ও-ই পারবে"।' কথাটা শুনে আমি তো থ। সত্যি বলতে কি বিশ্বাসও করিনি প্রথমটায়। মনে সংকোচ নিয়ে বোকার মতো ফস করে সাগরদাকে প্রশ্ন করে বসেছিলাম, 'কথাটা উনি সত্যিই বলেছেন?' সাগরদা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই বলেছিলেন, 'আমি কি তোমায় মিথ্যে কথা বলছি?' মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম ওঁর ঘর থেকে। মনের মধ্যে তখন বিস্ময় ও উচ্ছ্বাস মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তার কিছুদিন পরেই বাদলদার সঙ্গে একদিন গেলাম বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে। তখন তিনি সুস্থই ছিলেন। নিজে এসে দরজা খুলে আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বিশ্ববন্দিত সেই মানুষটি। আমার কাছে তা ছিল ঈশ্বর দর্শনের সমান। মনে হয়েছিল পিছনে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘকায় যে পুরুষটি, সে যেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। সুদীর্ঘ এক দেবতা, তাঁর সেই ভারী কণ্ঠস্বর, তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি সব মিলিয়ে মুগ্ধতার ভিড়ে নিজের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। উনি যে কয়েকবার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিবার মনে হয়েছিল একটা এক্স-রে আই যেন আমায় দেখছে খুঁটিয়ে। উনি এইভাবেই বোধহয় যে কোনো মানুষকে সামান্য দেখেই বইয়ের মতো পড়ে ফেলতে পারতেন।

সেইবার 'দেশ'-এর পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হল সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার উপন্যাস, 'রবার্টসনের রুবী'। সেই প্রথম ফেলুদার উপন্যাসে ছবি আঁকলাম আমি। পূজাসংখ্যা ও পরে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'রবার্টসনের রুবী' বইয়ের প্রচ্ছদও এঁকেছিলাম আমি। তারপর 'কলকাতায় ফেলুদা', 'পাহাড়ে ফেলুদা', 'ফেলুদার পানচ', প্রফেসর শঙ্কু ইত্যাদি বেশ কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকেছি। পরবর্তীকালে সন্দীপবাবু আমাকে বলেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছবি আঁকার জন্য। সেখানেও ছবি এঁকেছি বেশ কয়েকবার। তাছাড়া সানন্দায় উজ্জ্বল চক্রবর্তীর 'পাঁচালী থেকে অস্কার' লেখাটির জন্য বেশ কিছু সত্যজিৎ রায়ের পোর্ট্রেট স্কেচ করেছিলাম। এইরকমই নানা কাজের মধ্যে দিয়ে বারংবার আমার কাছে ধরা দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। এখনও ধরা দেন যখনই শিল্প নিয়ে, সিনেমা নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে ভাবতে বসি কিংবা নতুন কোনো কাজের ভাবনাচিন্তা করি। এবং আমার বিশ্বাস আমার মতোই আরও অগণিত শিল্পী এবং সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত যে-কোনো মানুষের মনে তিনি ধরা দেন প্রতি মুহূর্তে।

লেখাটা এইবার শেষ করি একটা মজার ঘটনার মাধ্যমে। সাগরদা আমায় যেদিন প্রথম 'দেশ' পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের লেখার সঙ্গে ছবি আঁকার কথা বললেন, সেই দিনটার কথা আগেই লিখেছি। সেইদিন সাগরদাকে যেহেতু আমি অমন একখানা সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলাম, তাই পরের সংখ্যাতেই উনি সত্যজিৎবাবুর আমাকে নিয়ে সেই উক্তিটাই ছেপে দিলেন, 'এখন থেকে আমার সমস্ত গল্প-উপন্যাসের ছবি আঁকবে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কারণ ও-ই পারবে।' এই উক্তি আমার শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কিশোর ভারতী

পোর্ট্রেট সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
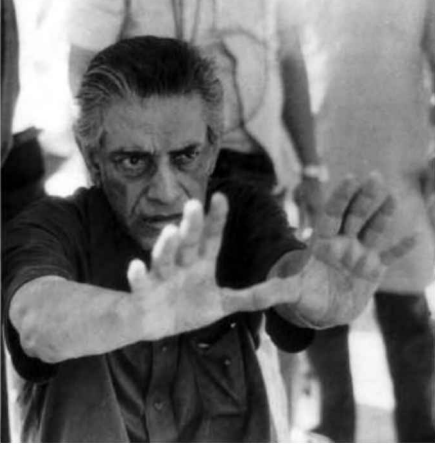
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যে জন মানিক

সালটা ১৯৭৪। বাড়িতে কালো ডায়ালওয়ালা টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। বাবাই ফোন ধরেছিলেন। ওপারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না। শুধু এপারে বাবার কথপোকথন শুনতে পাচ্ছি। বাবা বলছেন 'মশাই আপনার আন্তর্জাতিক খ্যাতি। আমার মতো মানুষকে ডেকে কেন নিজের বিপত্তি বাড়াচ্ছেন?...আমার চোদ্দো পুরুষে কেউ কোনওদিন অভিনয় করেনি...! এখানেই বলে রাখি আমার পিতৃদেব বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংগীতজ্ঞ, আড্ডাবাজ, গ্রন্থপ্রেমী একজন মানুষ। যিনি পরবর্তী জীবনে অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন-এর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে।

ফোন শেষ হলে বাবা জানালেন, সত্যজিৎ রায় ফোন করেছেন। 'সোনার কেল্লা' বইটি চলচ্চিত্রায়িত হবে। তাতে বাবাকে একটা ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

তবে, এই চলচ্চিত্রটির পেছনে একটা ছোট্ট গল্প আছে। শোনা যাক বাবার নিজের ডায়েরিতে লিখে যাওয়া কথা—

'এক বন্ধুর বাড়িতে বসে সন্ধেবেলায় আড্ডা মারছি। হঠাৎ এক সুঠাম ভদ্রলোক এলেন। বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন ইনি জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা বিশ্ব ঘুরে ছয়শত জাতিস্মর আবিষ্কার করে গবেষণা করছেন।... তখনকার ব্লিজ ও যুগান্তর পত্রিকায় হেমেনবাবুর জাতিস্মরের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে বার হচ্ছিল। আমি অলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাসী বলে এই কাহিনীগুলো পড়তাম। তাই হেমেনবাবুকে পেয়ে খুশি হলাম।...অনেক সুধী ও বিদগ্ধজনকে নিয়ে আমার বাড়িতে খোলা হল প্যারাসাইকোলজি সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা। পরামনোবিজ্ঞানের নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।...হঠাৎ এক সকালে টেলিফোন এল আমাদের সমিতির লাইফ মেম্বার জগৎবরেণ্য চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে। সেই ধমক, কেন যাই না! মার্জনা চাইলাম। 'একবার দেখা করুন। দরকার আছে।' পরের দিনই গেলাম। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আমি লিখে ফেলেছি। প্যারাসাইকো নিয়ে গল্প। আমি তো আনন্দে বিহ্বল। এ বই সবাই পড়বে আর পরামনোবিজ্ঞানের বিষয়ে শিখে যাবে। তিনি তাঁর লেখা নতুন বই দেখালেন। নাম পড়লাম— 'সোনার কেল্লা'। এর দু-বছর পর সোনার কেল্লা ছবি করলেন শ্রী রায়। আমাকে আতঙ্কিত করে, বিস্মিত করে এ ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করালেন। আমাকে অভিনেতা বানিয়ে দিলেন। তারপর ছবি করলেন পরপর। জন অরণ্য, জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরক রাজার দেশে ও ঘরে বাইরে। প্রতিটি ছবিতে আমায় ভূমিকা দিয়ে আমায় দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দিলেন।...'

সেই শুরু বাবার মাধ্যমে এই মানুষটির সান্নিধ্য পাওয়া। প্রথম দিন দেখি আধো অন্ধকারে স্টুডিয়োর ফ্লোরে। সেদিন বাবারই দৃশ্যের শুটিং সোনার কেল্লায়। মা ও দিদির সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম শুটিং দেখতে। স্টুডিয়োর ফ্লোরে এসে চেয়ারে বসলেন। বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন। সহাস্যে ছোট নমস্কার। বছর চোদ্দোর আমি প্রণাম করতেই গাল টিপে আদর করে দিলেন। সেই প্রথম দেখার অনুভূতি আজও অম্লান।

এরপর জন অরণ্য। এক রবিবার সকালে সত্যজিৎবাবু চলে এলেন আমাদের এন্টালির বাড়িতে। সঙ্গে অনিলবাবু, কামুদা আর নিমাই ঘোষ।

SATYAJIT RAY

[illegible]

২২/১২/৮২

সেই প্রথম আমাদের বাড়িতে ওনার আসা। এসেছিলেন আমাদের বাড়ির পিছনে মতিঝিল বস্তিতে লোকেসান দেখতে। পছন্দ হয়েছে ওনার। শুটিং হবে। ঘুরে ঘুরে আমাদের বাড়িতে দেখলেন বাবার সংগ্রহ। বললেন পরের বার এসে বইগুলো ভালো করে দেখবেন।

যাই হোক 'জন অরণ্য'-র শুটিং-এর দিন মতিঝিল বস্তিতে ভিড় উপচে পড়ছে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় প্যাক আপ হল। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে পুরো টিম সঙ্গে এলেন আমাদের বাড়িতে। চা চক্রে আড্ডা জমে উঠল। সেবার সন্দীপদাও ছিলেন আর ছিলেন 'ভুবন সোম' হলাম বাবার সঙ্গী। তখন কলেজে পড়ি। বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে একটা একস্ট্রা মাইলেজ। গেলাম বেনারস। পৌঁছেই বাবা উঠলেন হোটেলে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে পিক্ আপ কল থাকবে। আমি রইলাম বাবার গুরুদেবের আশ্রম লহুড়াবীড়-এ। আমার সঙ্গে রইল আর এক বিমল। বিমল ব্যানার্জি। এই বিমলদা হচ্ছেন অভিনেতা মণ্টু ব্যানার্জীর ভাই। যাই হোক আমরা তৈরি হয়ে গেলাম বাবার হোটেলে। কাছেই ছিল সেটা। সেখান থেকে যাওয়া হল বেনারসের ঘাটে। আজ সেখানে সেই দৃশ্যটা শট্ নেওয়া হচ্ছে—বজরার ছাদে ইজিচেয়ারে বসে মগনলাল
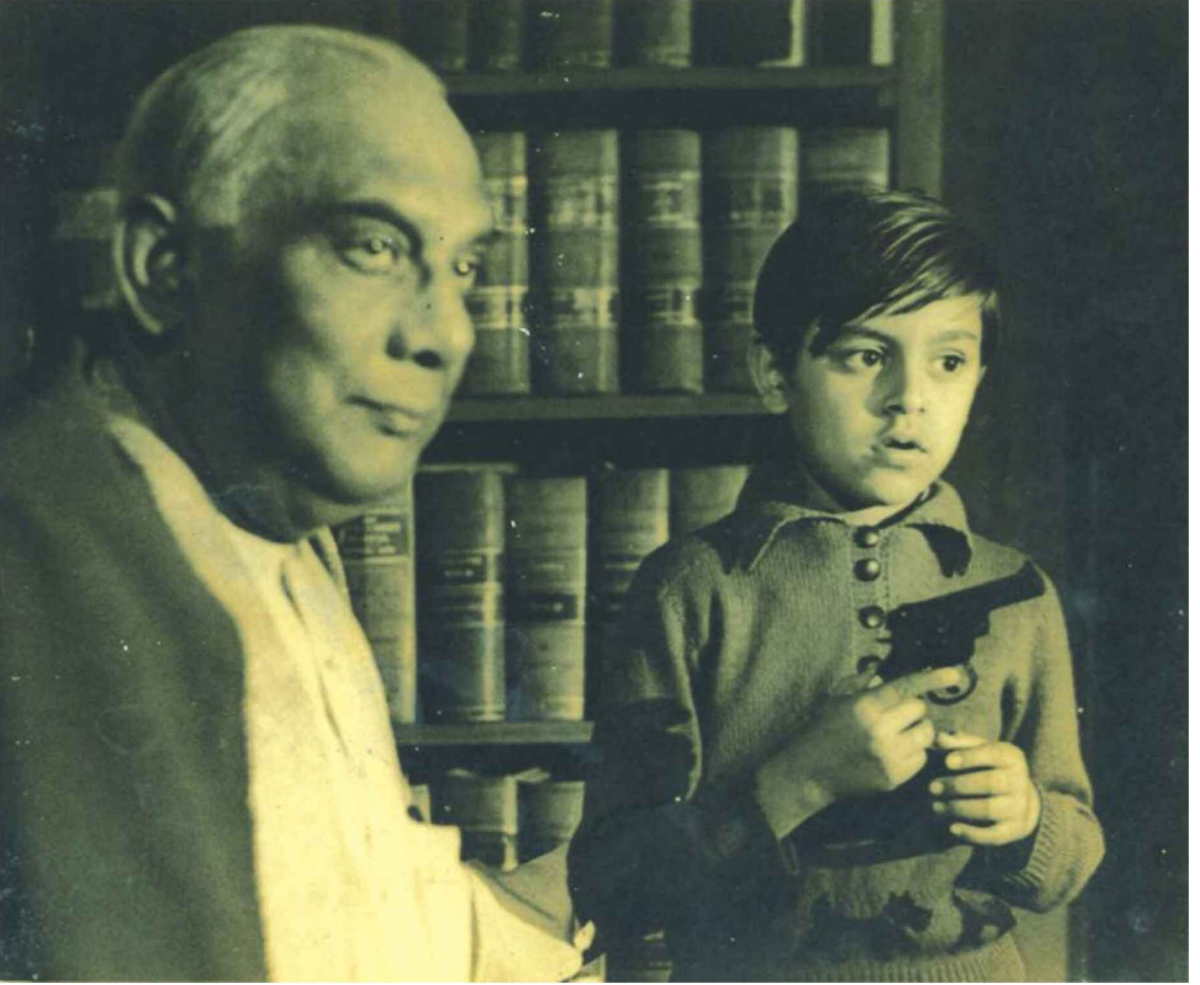
চলচ্চিত্রের নায়িকা সুহাসিনী মূলে। তখন তিনি সত্যজিৎবাবুর সহকারী। কী অসম্ভব ক্ষমতা সত্যজিৎ কাকাবাবুর দেখে অবাক হলাম। সেই সকাল থেকে সমানে শুটিং করে যাচ্ছেন। প্যাক আপ করার পরও আমাদের বাড়িতে ঘণ্টা দেড়েক আড্ডা দিলেন। সেদিনই প্রথম ওনার অটোগ্রাফ নিই সুকুমার গ্রন্থাবলীতে। এরপর 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'। এই সময়ে সত্যজিৎ কাকাবাবু আবার এলেন বার দুয়েক আমাদের বাড়ি। বাবার সংগ্রহের বইগুলো দেখলেন এবং বাছলেন। বাবার সংগ্রহ থেকে বেশ কিছু পুরোনো বই গেল 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র সেটে, সেগুলো ১৮৫৭ সালের আগে মুদ্রিত। এতোটাই পার্ফেকসানিস্ট্ ছিলেন মানুষটি।

১৯৭৯-তে জয় বাবা ফেলুনাথ। আমি জড়িয়ে পড়লাম এই শুটিং টিমটার সঙ্গে। বাবাকে যেতে হবে আউটডোর শুটিং-এ বেনারস। আমি মেঘরাজ আসছেন। বজরা ঘাটে লাগতেই শুটিং শেষ, লাঞ্চ ব্রেক। দেখা হল সত্যজিৎ কাকাবাবুর সঙ্গে। প্রণাম করলাম। কানের কাছে মুখটা নামিয়ে বললেন, যেন প্যাকেট লাঞ্চ খেয়ে নিই। কামুদা কোথা থেকে এসে একটা লাঞ্চ প্যাকেট ধরিয়ে দিল। খাব কি! লজ্জা হচ্ছে। দিন দশেক ছিলাম বেনারসে। দু-দিন বাদে ঠান্ডায় আমার ধুম জ্বর এল। তিনদিন বাদে সুস্থ হলাম। সেদিন জ্বর শেষে আবার বার হয়েছি। সেদিন সেই বিখ্যাত ঘোষাল বাড়িতে (আদতে জ্ঞান চক্রবর্তীর বাড়ি—অসি ঘাটের থেকে একটু দূরে) শুটিং। সকালে বিমলদার সঙ্গে গেছি বাবার হোটেলের সামনে। অনেকটা দূর থেকেই ওই দীর্ঘদেহী মানুষটি আমায় দেখেই বলে উঠলেন, 'আরে মাস্টার এসো এসো, কাছে এসো। জ্বর হয়েছে শুনলাম। কেমন আছ!' আমার মনে হল রাক্ষ্ম

- সোনার কেল্লা -
1974

স্তাটায় উড়ে যাচ্ছি। আমার মতো এত সাধারণ একজনের খোঁজ তিনি নিচ্ছেন।

বাবার চিঠি নিয়ে ওনার বিশপ লোফ্রয় রোডের বাড়িতে গেছি। নিজে দরজা খুলে আমায় ভেতরে নিয়ে গেছেন। এক কোণে জড়সড় হয়ে অপেক্ষা করছি। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ওনাকে। একটা ছবি আঁকছিলেন। সাদা-কালোয়। একটু বসতে বললেন। বাবার চিঠির উত্তর লিখে আমার হাতে দিলেন। তারপর আমার কাঁধে স্নেহের হাত রেখে নিজেই এগিয়ে দিলেন দরজা অবধি। জাস্ট ভাবা যায় না! তারপর আরও কয়েকবার গেছি। এরকমই একদিন গেছি কি একটা পৌঁছতে। দরজার Do not distub লেখা। অথচ যেটা দিতে গেছি সেটাও জরুরি। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলাম। এখন যে ঘরটায় সন্দীপদা বসেন, সেই ঘরটাতে বসেছিলাম প্রায় মিনিট পনেরো কুড়ি। ওটা আমার জীবনের সেরা পাওয়ার একটা। কানে এসে লাগছিল তাঁর বাজানো অর্গান। সুর সৃষ্টি করছিলেন। কত টুকরো টুকরো স্মৃতি। সব নিয়েই তো একটা উপন্যাস হয়ে যায় আলাদা।

হীরক রাজার দেশে চলচ্চিত্রের শুটিং হবে জয়পুরে। বাবাকে যেতে হবে। সঙ্গী অবশ্যই আমি আর সেই বিমল ব্যানার্জিদা। বিমলদা এই ছবিতে নিজেও অভিনয় করছেন একজনে রাজার ভূমিকায়। আমরা প্রথমে গেলাম দিল্লি। সেই প্রথম সন্দীপদার সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়া। দিল্লি থেকে একটা বিরাট বাসে ভোরবেলা রওনা দেওয়া হয়েছিল জয়পুরের পথে। কে নেই সেই বাসে! রবি ঘোষ, তপেন চট্টোপাধ্যায়-সহ পুরো ইউনিট। আর স্বয়ং সত্যজিৎ কাকাবাবু ও বিজয়া কাকিমা। পুরো রাস্তাটা

অন্যের গল্পে সত্যজিতের হেডপিস

আষাঢ়ে—মহাশ্বেতা দেবী। ছবি সত্যজিৎ রায়

মেনী সর্দার—ননীগোপাল মজুমদার। ছবি সত্যজিৎ রায়

জমিয়ে রেখেছিল কামুদা আর ননীদা তাদের হাস্যকৌতুকে। আমি বাসের একদম পেছনের সিটে বসে পুরো বাসটাকে ফ্রেম করে মনের মধ্যে ছবি ধরে রাখছিলাম। এ স্মৃতিগুলোই তো জীবনের সম্পদ।

জয়পুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে নায়লা বলে একটা জায়গায় শুটিং হয়েছিল। সেখানে সেদিন বিশাল সামিয়ানা টাঙানো। তার তলায় বসে মেক আপ চলছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সহ সবাই উপস্থিত। প্রচুর উট আর হাতি এসেছে। নিমাইবাবু ছবি তুলেই যাচ্ছেন। আমার সারা জীবনের আফশোষ ওইদিন হোটেলের ঘরে আগফা ক্যামেরাটা ফেলে এসেছি। এ যন্ত্রণা শেষ দিন অবধি যাবে না। যাই হোক সবাই ব্যস্ত খোশগল্পে। কিন্তু ওই মানুষটি মাথায় একটা হ্যাট পরে সোজা চলে

কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন এটাই তার প্রমাণ যে একজন কিশোরের লেখাকে তিনি উৎসাহিতও করেছেন তাঁর শত কাজের মধ্যেও। আমার 'কিঞ্জল' পত্রিকার কার্টুন সংখ্যা প্রকাশ করলাম ১৯৮৮ সালে। আবার আব্দার তাঁর কাছে, কিছু লিখে দিতে হবে। একটা সুন্দর আশীর্বাণী লিখে দিলেন। কাউকে কখনো বিমুখ করেননি।

ঘরে বাইরের সময়ে পুরুলিয়ার আউটডোর যেতে পারলাম না কলেজের পরীক্ষার জন্য। বাবা একাই গেলেন। মাঝে বইমেলায় একবার হঠাৎ দেখা হল সত্যজিৎ কাকাবাবুর সঙ্গে। বইমেলা তখন হতো পার্ক স্ট্রিটে। মেলা বন্ধের মুখে উনি এসেছেন আনন্দ-র স্টলে। তখন লিটিল ম্যাগাজিন হতো ছাতার তলায়। সেদিন আমার মা-ও গিয়েছিলেন

গেছেন সেই স্পটে। সেখানে বালির ওপর সাজানো হয়েছে হীরক রাজার দেশে ঢোকবার তোরণদ্বার। ওই বালির মধ্যেই এপ্রান্ত থেকে হেঁটে যাচ্ছেন ওপ্রান্তে। ওপ্রান্ত থেকে এপ্রান্তে। কোনো কাগজের পতাকার কোনোটা একটু মুড়ে গেছে হাত দিয়ে ঠিক করে দিচ্ছেন। সঙ্গে কামুদা। আমি মুগ্ধ চোখ নিয়ে দেখে যাচ্ছি। শিখছি জীবনের নতুন অধ্যায়।

কী অসাধারণ এটিকেট্। ওনার সিনেমার নামগুলো নিয়ে একটা কবিতা লিখে বাবার হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম সত্যজিৎবাবুকে পড়াবার জন্য। ছোটবেলার পাগলামো। বাবাও বোধহয় আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য ওনাকে লেখাটি পড়তে দিয়ে এসেছিলেন। কয়েকদিন বাদে বাবাকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি শেষে লিখলেন, 'আপনার পুত্রকে বলবেন তার কবিতাটি খাশা হয়েছে। এবং আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে।' অমূল্য রতনের মতো সে চিঠি এখনো আমার কাছে রাখা আছে। এখন সে কবিতাটা দেখলে হাসি পায়, কিন্তু সত্যজিৎ কাকাবাবু

আমার সঙ্গে মেলায় আমার স্টলে। আমরা টেবিল গুছিয়ে তৈরি হচ্ছি। মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখি মা, সত্যজিৎ কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। আমি দৌড়ে গেলাম। ওই চলন্ত অবস্থায় মাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন। নমস্কার করে বাবার স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছেন। সামান্য দু-একটা কথা। তারপর আর কথা হয়নি কখনও। শেষ দেখা বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ির বারান্দায়। সন্দীপদার কাছে একটা প্রয়োজনে গেছি। পেছনের দরজার বেল বাজাতে কাজের লোক দরজাটি অল্প খুলল। নাম বললাম। দেখলাম একটা গেঞ্জি আর পায়জামা পরে সত্যজিৎ কাকাবাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। তার কিছুদিন আগেই ফিরেছেন নার্সিংহোম থেকে। আমার কণ্ঠস্বর পেয়ে শুধু তাকালেন আমার দিকে। অদ্ভুত চাউনি। বোঝাতে পারব না। সে চাউনি আজও চোখ বুঁজলে দেখতে পাই, কিন্তু চাই না সে স্মৃতিকে মনে রাখতে। আমার স্মৃতিতে যে মানুষটি উজ্জ্বল হয়ে আছেন তাঁকে প্রণাম জানাই। কিশোর ভারতী

দেখেছ—তাতে পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা জোড়া সত্যজিৎ রায়ের ইলাস্ট্রেশনস্‌ও আলবাত দেখেছ। ১৯৬১ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য উনি কম লেখকের গপ্পে ছবি আঁকেননি। কিন্তু, একটা কথা কি জানো? 'সেরা সন্দেশ' বইটিতে ওঁর আঁকা যে সব ছবি দেখতে পাও—সেগুলোর সব কিন্তু উনি নতুন করে এঁকেছিলেন, কেবল ওই বইটির জন্য। তিন-সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার বৃহৎ বইটির জন্য শ'কয়েক ছবি এঁকেছিলেন।

'সেরা সন্দেশ'-এর প্রসঙ্গ এই জন্যই তুললাম, কারণ সন্দেশ কাগজের সম্পাদক সত্যজিৎ রায়ই আমার আজকের গপ্পের মুখ্য বিষয়। সন্দেশী লেখক শিল্পীদের মুখে শুনেছি সম্পাদক সত্যজিৎ রায় অনেক সময়ে লেখা সম্পাদনার সময়ে যেমন চিরকুট লিখতেন, তেমনই কখনও সখনও লেখককে সশরীরে ডেকে পাঠাতেন নিজের বাড়িতে। তারপর লেখাটার খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতেন লেখকের সঙ্গে। এই মুহূর্তে হাতের কাছে একটা উদাহরণ পাচ্ছি। সেইটে তোমাদের সামনে দিলে, বুঝতে পারবে।

সৌম্যকান্তি দত্ত

সম্পাদনার খুঁটিনাটি ও সত্যজিৎ রায়

সম্পাদনার কাজটা মোটে সহজ নয়—এটা তোমরা ভালো করেই জানো। তা সে যে-কোনও বিষয়েরই সম্পাদনা হতে পারে। লেখা হোক, চলচ্চিত্র হোক, ছবি আঁকা হোক এমন কী কথারও সম্পাদনার প্রয়োজন আছে। এই সম্পাদনা বলতে কিন্তু কেবল কাটছাঁট বোঝায় না। কাটছাঁটের কাজও যেমন দরকার, তেমনই নতুন কিছুর সংযোজনও দরকার। আর এসবের থেকেও বড় ব্যাপার এই দুইয়ের মাঝখানে ব্যালান্স করে চলা। ব্যাপারটার খুঁটিনাটি একেবারে নিখুঁত ভাবে বুঝতেন যিনি—তাঁর এবার শতবর্ষ। আশা করি, বুঝতেই পারছ কার কথা বলছি।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, তিনি সত্যজিৎ রায়। মসুয়ার রায় পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌত্র এবং সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ সম্পাদক হিসেবে প্রথম আসেন তাঁর বাপ-ঠাকুরদার সাধের পত্রিকা 'সন্দেশের' ১৯৬১ সালের মে মাসে নবপর্যায় প্রকাশের সময়। সঙ্গে অবিশ্যি আরেকজনকে পাশে নেন—তিনি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ওই যে বললাম, সম্পাদক তকমাটি তাঁর নামের পাশে প্রথম ছাপা হয় ১৯৬১-তে, যখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়েস। কিন্তু, তাঁর অনেক আগে থেকেই তিনি সম্পাদনার ব্যাপারে হাত পাকিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। কারণ, আগেই বলেছি সম্পাদনা কেবল লেখা-আঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু, আজ তোমাদের সত্যজিৎ রায়ের লেখা-আঁকার সম্পাদনার বিষয়েই কথা বলতে বসেছি।

এখন ব্যাপার হচ্ছে, আমি তো তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার জন্মের সাত বছর আগেই তিনি চোখ বুঁজেছিলেন। কিন্তু, তাঁর সংস্পর্শে থাকা মানুষজনের কাছ থেকে গপ্পো শুনে, তাঁর কাজকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে কিছু ব্যাপার খেয়াল করেছি। এখন, সে সব মিলিয়েই আজকের গপ্পো বলি।

তোমরা সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সেরা সন্দেশ' বইটি নিশ্চয়ই

চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর ছড়াকে সম্পাদনা করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। সৌজন্যে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং বিচিত্রপত্র।

অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠির 'এয়ার মেল' খাম।

আগের পৃষ্ঠায় হাতের লেখায় যে ছড়াটি দেখতে পাচ্ছ, এটা যে সত্যজিৎ রায়ের হাতে লেখা—সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন বিষয় হচ্ছে, হাতের লেখাটা সত্যজিৎ রায়ের হলেও লেখাটা (ছড়া) কিন্তু ওঁর নয়। আসলে লেখাটা লিখেছিলেন অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ওরফে দীপক চক্রবর্তী।

ব্যাপারটা কী, সেটা চিরঞ্জিতবাবু স্বয়ং বুঝিয়েছিলেন শারদীয়া 'বিচিত্রপত্র' ২০১৮ সংখ্যায়—'সেদিন সকালটা ভীষণ সুন্দর ছিল। ঝকঝকে রোদ, ফুরফুরে হাওয়া। ১৯৭০। একেকটা দিন এমন হয় না—অন্যদিনের থেকে আলাদা, একটু বেশি উজ্জ্বল! প্রত্যেকবারই এমন হয়। বিশপ লেফ্রয়ের মুখটায় ঢুকলেই বুকটায় একটু দুরুদুরু করে, তার ওপর হাতে আবার আমার সেই ছড়া-ছবি-কবিতার খাতা। কাল রাতেই একটা নতুন ছড়া লিখে ফেলেছিলাম, সেটাই দেখাতে যাচ্ছি মানিকদাকে। গতকালই এটার কথা বলেছিলাম ওনাকে। সাবজেক্টটা শুনেই উৎসাহিত হয়ে ছড়াটা নিয়ে আসতে বলেছিলেন।...আমার ছড়াটা ওনার এত ভালো লেগেছিল যে উনি দু-একটা কারেকশন করে আমাকে প্রেজেন্ট করলেন।'

আশা করি, ব্যাপারটা খুলে বোঝাতে পারলাম।

এ তো গেল একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনার কথা আমার যেমন মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। সেবার শান্তিনিকেতন গিয়েছি, এদিক-ওদিক ঘুরতে ফিরতে একবার ঢুঁ মারলাম সেবা পল্লীতে লেখক অজেয় রায়ের 'অজয়াদ্রি' বাড়িতে। ও-বাড়িতে এখন প্রয়াত অজেয় রায়ের বৃদ্ধা স্ত্রী থাকেন। আমরা সন্দেশীরা গেলে ভারি খুশি হন। তো উনি আর অজেয় রায়ের বড় মেয়ে কস্তুরী রাণার সৌজন্যে একটা মহামূল্যবান জিনিস হাতে পেয়েছিলাম। তোমরা ভাই অনেকেই অজেয় রায়ের বিখ্যাত রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'মুঙ্গু' পড়েছ। তার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা চমৎকার সব ইলাস্ট্রেশনস্‌ও দেখেছ। কিন্তু, একটা ব্যাপার বোধহয় জানো না 'মুঙ্গু' উপন্যাসটির আক্ষরিক অর্থে নতুন রূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ। ব্যাপারটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলে বুঝি? দাঁড়াও, খুলে বলি—তাহলে ঠিক বুঝবে।

অজেয় রায় তখন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত। লেখক হিসেবে মোটেই পরিচিত হননি তখনও। ওঁর বাড়ি থেকে কিছু দূরেই রতনপল্লীতে সন্দেশ কাগজের বড় সম্পাদিকা লীলা মজুমদারের বাড়ি। অজেয় মাঝেমধ্যেই সন্ধের দিকে ঘুরতে ফিরতে চলে যান লীলা মজুমদারের কাছে। কিছুদিনের মধ্যেই লীলা মজুমদারের স্নেহের অন্তুতে (অজেয় রায়ের ডাকনাম) পরিণত হন তিনি।

একদিন বলা নেই কওয়া নেই, একগোছা কাগজ হাতে নিয়ে অজেয় এসে দাঁড়ালেন লীলা মজুমদারের সামনে। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'লীলাদি,

SATYAJIT RAY
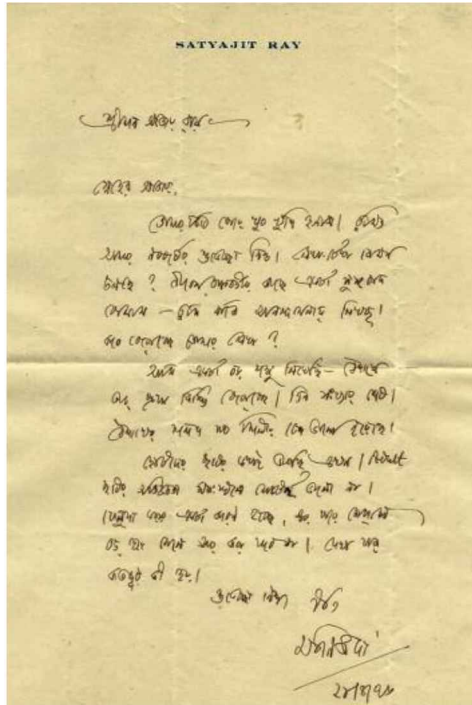
অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি-১

SATYAJIT RAY
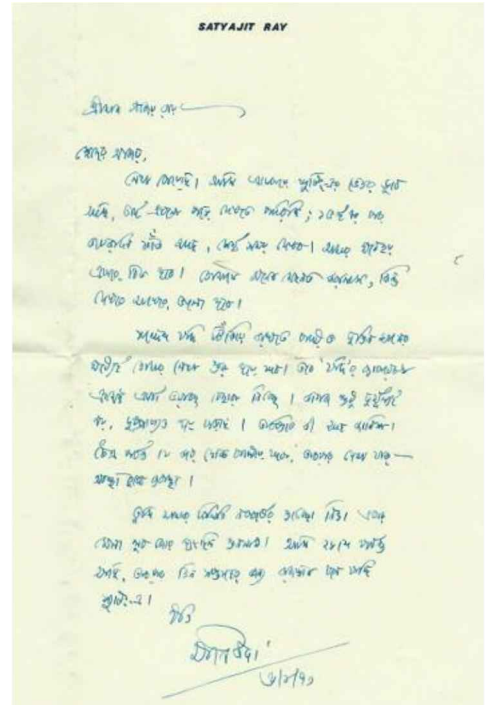
অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি - ২
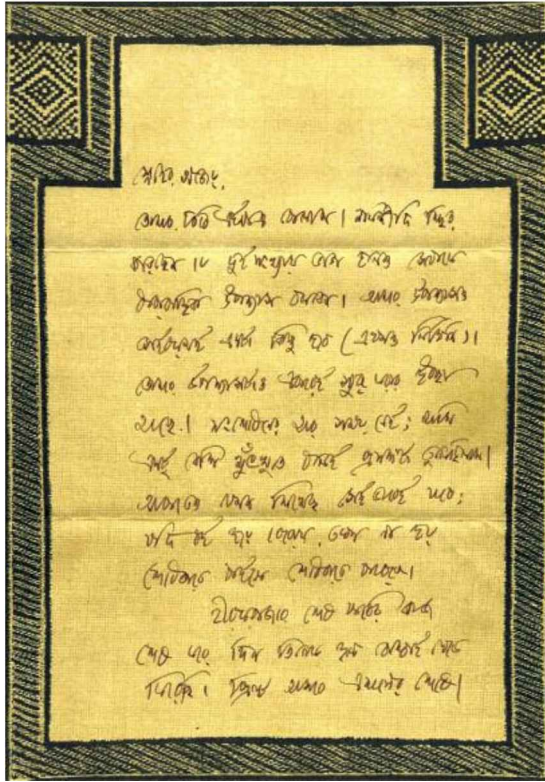
অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি-৩(১ম)
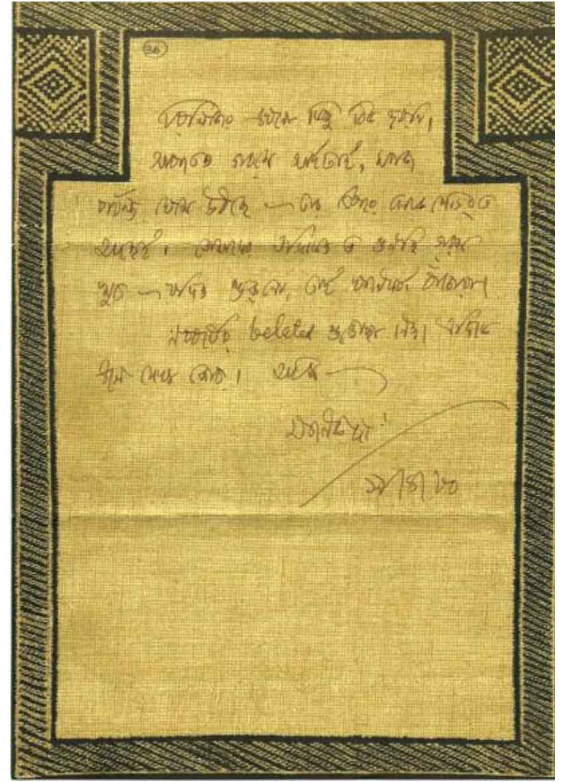
অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি-৩ (২য়)

একটা উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করেছি। একবার চোখ বুলিয়ে দেখবেন?'

লীলা মজুমদার সহাস্য বদনে জবাব দিলেন, 'বেশ তো। লেখাটা রেখে যা। আমি পড়ে তোকে জানাব'খন।'

এরপর কিছুদিন কাটতে-না-কাটতেই একদিন লীলা মজুমদারের জরুরি তলব, অজেয় রায়কে ডেকে বললেন, 'অন্তু, তোর লেখাটা পড়েছি। চমৎকার লেখা! আমি এটা নিনি আর মানিকের কাছে পাঠাচ্ছি। ওরা কী বলে দেখা যাক।'

এই নিনি হলেন সন্দেশের ছোট সম্পাদিকা নলিনী দাশ এবং মানিক তো সত্যজিৎ রায়। অজেয় রায় তো বেজায় খুশি হলেন, লীলা মজুমদারের থেকে এমন রিমার্ক পেয়ে।

এরপর কিছুদিন কাটল, তারপর হল কি—একদিন একটা চিঠি এল ডাকে অজেয় রায়ের নামে, তাঁর 'অজয়াদ্রি' বাড়িতে। চিঠির লেখক কে—স্বয়ং সত্যজিৎ রায়! অজেয় রায় নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না! সেই চিঠির খামের ছবিটা এখানে দিলাম, দেখো তো, কেমন লাগে!

কিছুক্ষণের অবাক, বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠে চিঠিটি পড়ে উনি যা জানলেন তা এই যে—'মুঙ্গু' উপন্যাসটি সত্যজিৎ রায়ের খুব পছন্দ হয়েছে। তবে লেখার কিছু কিছু জায়গায় সামান্য কিছু অদল-বদলের প্রয়োজন আছে। সেই সংশোধনগুলো উনি নিজে হাতে পাণ্ডুলিপির মধ্যে করে দিয়েছেন। নিজের পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে অজেয়র চক্ষু তো ছানাবড়া! সন্দেশের সম্পাদক সত্যজিৎ রায় করেছেন কি! তাঁর মতো অমন ব্যস্ত লোক, নিজের হাজারো কাজের মাঝে একজন নতুন লেখকের লেখায় এতওটা সময় দিয়েছেন! কী খুঁটিয়ে সম্পাদনা করেছেন লেখাটার! ঠিক এরকমই ঘটেছিল মঞ্জিল সেনের বিখ্যাত উপন্যাস 'ডাকাবুকো'-র সময়। লেখাটা তো প্রথমে প্রায় বাতিলই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর আশ্চর্য

SATYAJIT RAY
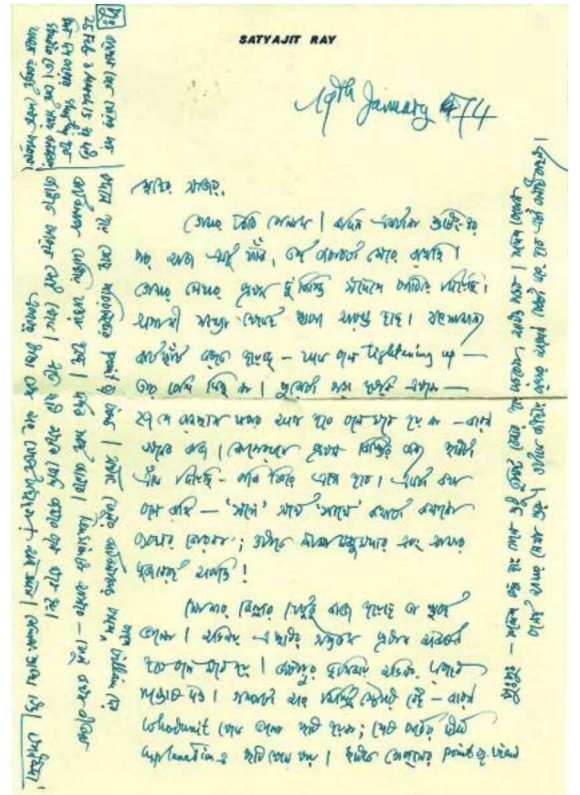
অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি— ৪

ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পাদনা করলেন যে, 'ডাকাবুকো' বাংলার কিশোর অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের বিরাট তালিকায় পাঠকদের মনে স্থান করে নিয়েছিল সেই কবেই। এখন, কথা হচ্ছে আমরা কজন সন্দেশী সৌভাগ্যবান যে সত্যজিৎ রায়ের সংশোধন করা অজেয় রায়ের সেই 'মুঙ্গু' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম দু'-চার পৃষ্ঠা চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম একবার। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কিশোর ভারতীর পাঠকপাঠিকা, অর্থাৎ তোমাদেরকে দেখাব বলে সেই পাণ্ডুলিপির ক'টা পৃষ্ঠা সম্প্রতি অজেয় রায়ের বাড়িতে খোঁজ করতেই খবর—পেলাম ইতিমধ্যেই সেটি কেউ বা কারা চক্ষুদান করেছেন! হয়তো-বা দুষ্টু ভূতেও হাওয়া করে থাকতেই পারেন! সে যাকগে—যা গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে কীই-বা লাভ আছে!

SATYAJIT RAY

অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি-৫ (১ম)

অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি-৫ (২য়)

অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের প্রায় খান চল্লিশেক চিঠির মধ্যে বেশ কিছু চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায়। সেই চিঠিপত্রের মধ্যে থেকে খান পাঁচেক চিঠির মূল পাণ্ডুলিপি থেকে এখানে তোমাদের জন্য তুলে দিলাম। আশাকরি, তোমরা এগুলো দেখে 'মুঙ্গু'র পাণ্ডুলিপি না দেখার দুঃখটা কিছুটা হলেও কমবে।

সন্দেশ-সম্পাদিকা নলিনী দাশকে লেখা সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদকীয় চিরকুট (১ম অংশ)

সন্দেশ-সম্পাদিকা নলিনী দাশকে লেখা সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদকীয় চিরকুট (২য় অংশ)

এখন তোমাদের আরেকটা কথা বলি। এই সেদিন, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে একটা চিরকুট পেলাম। লেখক অবশ্যই সত্যজিৎ, লিখেছেন তাঁর 'নিনিদি' অর্থাৎ নলিনী দাশকে। সন্দেশ সম্পাদনা কালে সম্পাদকেরা নিজেদের মধ্যে নানান এডিটোরিয়াল চিরকুট আদান-প্রদান করতেন। এটি সেরকমই একটা। সেই চিরকুটের ছবি দিলাম।

সম্পাদক সত্যজিৎ আর তাঁর সম্পাদনার খুঁটিনাটি নিয়ে লিখতে বসলে তো রাত কাবার হয়ে যাবে, গপ্পো আর ফুরবে না কিন্তু, 'কিশোর ভারতী'র এই বিশেষ সংখ্যার পৃষ্ঠা ফুরোতে পারে! সে ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের হবে না। কাজেই আজ এ-পর্যন্তই থাকল—এবার মানে মানে কেটে পড়ি। পরে আবার কোনও সময় গপ্পের ঝুলি খুলে বসব'খন।

কিশোর ভারতী

কৃতজ্ঞতা ঃ সন্দেশ, বিচিত্রপত্র, রে সোসাইটি ও অজেয় রায়ের পরিবার

সত্যজিৎ রায়

অজ্ঞাত প্রাণীর সন্ধানে

কোনো প্রাণিবিদ্ আজ আর জোর দিয়ে বলতে পারেন না যে পৃথিবীতে এমন আর কোনো প্রাণী নেই যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষে জানে না। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে একজন বিশ্ববিখ্যাত প্রাণিবিদ্ জর্জ বুভিয়ের জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে মানুষের অজানা আর কোনো চতুষ্পদ জানোয়ার পৃথিবীতে নেই। এর কিছুদিনের মধ্যেই আফ্রিকায় একটি আনকোরা নতুন জানোয়ার টাপির আবিষ্কৃত হয়। আসলে পৃথিবীতে আজও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি। যেমন মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা বা সাইবেরিয়ার জঙ্গলের কিছু অংশ। এইসব অঞ্চলে নানারকম অজানা প্রাণী থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

বেশ কিছুকাল থেকেই পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে নতুন শ্রেণীর লোমশ জানোয়ারের খবর আসছে। শুধু খবর নয়, ক্যামেরায় তোলা ছবিও। কিন্তু এইসব জানোয়ারের একটিকেও এখনো পর্যন্ত ধরা যায়নি, বা এদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। কাজেই তারা যে সত্যিই আছে তার অকাট্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি, যদিও তাদের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। শুধু এইসব জানোয়ার সন্ধানের জন্যই নানান সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় অভিযান চালানো হচ্ছে।

এই অজ্ঞাত জানোয়ারদের মধ্যে অবিশ্যি সবচেয়ে বিখ্যাত হল হিমালয়ের ইয়েতি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Abominable Snowman আর বাংলায় তুষার মানব। হিমালয়ে পর্যটনকারী বহু দল বরফের উপর ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি তুলে এনেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছবি হল ১৯৫১-র একটি বৃটিশ অভিযানে অংশগ্রহণকারী এরিক শিপটনের তোলা। এর পরে আরো বেশ কয়েকবার এভারেস্ট অভিযানের দলের লোকেরা এই জাতীয় পায়ের ছাপ বরফে দেখেছে এবং তার ছবি তুলেছে। ১৯৭৯-তে একটি বৃটিশ এভারেস্ট অভিযানের দলপতি লর্ড হান্ট ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি তোলেন যা ছিল লম্বায় ১৪ ইঞ্চি আর চওড়ায় ৭ ইঞ্চি। ১৯৭৫ সালে জানুস টোমাশুক নামে এক পোল্যান্ডবাসী এভারেস্ট অঞ্চলে ভ্রমণ বা ট্রেকিং করতে করতে হাঁটু মচকিয়ে বরফে বসে পড়ে। সাহায্যের জন্য তার দলের অন্য লোকদের ডাকতে গিয়ে টোমাশুক দেখেন যে একটি দ্বিপদ প্রাণী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। টোমাশুক প্রাণীটিকে মানুষ মনে করে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছে ডাকেন। একটু কাছে আসতেই টোমাশুক বুঝতে পারেন

ইয়েতির পায়ের ছাপ (শিপটনের তোলা ছবি)

প্যাটারসন ও বিগফুটের পায়ের ছাপের ছাঁচ।

যে প্রাণীটি মানুষ নয়; প্রায় ছ ফুট লম্বা, হাঁটু অবধি লম্বা হাত বিশিষ্ট বানর জাতীয় কোনো অজানা জানোয়ার। টোমাশুক প্রাণীটিকে দেখে ভয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠায় সেটি অন্যদিকে চলে যায়।

নেপালের শেরপারা সাধারণত তিন রকম ইয়েতির কথা বলে থাকে। এক হল 'জু তেঃ'। এরা নাকি আকারে বিরাট, এবং চমরি গাই, ছাগল ইত্যাদি ধরে খায়। অনেকের মতে এই জু তেঃ হল এক শ্রেণীর হিমালয়বাসী ভাল্লুক—যাকে বলে 'ব্লু বেয়ার', এবং যার দেখা এখনো সভ্য মানুষে পায়নি। তবে ভুটান থেকে পাওয়া এই ব্লু বেয়ারের একটি চামড়া লণ্ডনে বিক্রি করে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, কাটমাণ্ডুবাসী ডেসমন্ড ডয়েগ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ইয়েতিকে শেরপারা বলে 'থেলমা'। এরা নাকি আকারে ছোট। ডয়েগ সাহেবের মতে এই থেলমা হল আসলে গিবন জাতীয় বানর।

তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েতির নাম হল 'মিঃ তেঃ'। এরা নাকি হিংস্র, দেখতে ওরাং ওটাঙের মতো, এবং মানুষখেকো। এরা ২০,০০০ ফুট এবং তারও বেশি উচ্চতায় বাস করে।

ইয়েতি জাতীয় কোনো এক প্রাণী যে হিমালয়ে বাস করে তার প্রমাণ এর পায়ের ছাপ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু এরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে সেটা আজ পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।

আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টেটের অধিবাসী এক পুলিশ অফিসার সার্জেন্ট গামাশ মাছ ধরা সেরে তাঁর গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী কেথি। হঠাৎ গামাশ দেখেন কিছুদূরে একটি গাছের পাশ থেকে একটি লোক বেরিয়ে তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। গামাশ বলছেন, 'একটু কাছে আসতেই বুঝলাম লোকটা মানুষ নয়। লোমশ কোনো দ্বিপদ জানোয়ার। আমি গাড়ির গতি কমাতেই কেথি চিৎকার করে উঠল, কারণ প্রাণীটি দৌড়ে এসে জানালা দিয়ে তাঁর দিকে উঁকি মেরেছে।'

উত্তর আমেরিকার এই ইয়েতি-জাতীয় একটি প্রাণীর কথা প্রায়ই শোনা যায়। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিগফুট'। এর আমেরিকান-ইন্ডিয়ান নাম হল সাস্‌কোয়াচ। এর পায়ের ছাপ যে দেখা গেছে এবং তার থেকে ছাঁচ নেওয়া হয়েছে, সেটা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। রজার প্যাটারসন নামে এক ভদ্রলোক দাবি করেন যে তিনি এই বিগফুটের একটি ফিল্ম তুলতে পেরেছিলেন। এই ফিল্ম থেকে একটি ছবিও এখানে দেওয়া হল। দুঃখের বিষয় তিনি যখন এই ছবি তোলেন তার কোনো সাক্ষী ছিল না। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে এটা একটা ধাপ্পাবাজী; কোনো বেঢপ লম্বা মানুষের গায়ে জানোয়ারের ছাল চাপিয়ে

রজার প্যাটারসনের তোলা ফিল্ম থেকে বিগফুটের ছবি।

অ্যাল্‌মার পায়ের ছাপের ছাঁচ।

দিয়ে ছবিটা তোলা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে গত পঞ্চাশ বছরে উত্তর আমেরিকায় ও ক্যানাডায় এই বিগফুট বা সাস্‌কোয়াচকে বহুবার দেখা গেছে। কাজেই এটাকে কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একবার এই বিগফুটের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছিল যেটা বেশ কয়েক মাইল ধরে চলেছিল, এবং সেই ছাপ সংখ্যায় ছিল তিন হাজারেরও বেশি। এই ছাপ থেকে নেওয়া ছাঁচ সাধারণত ষোল থেকে আঠারো ইঞ্চি লম্বা হয়, অর্থাৎ মানুষের পায়ের ছাপের প্রায় দেড়া। আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ক্যানাডার বহু বৈজ্ঞানিক এই ছাঁচ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে এটা মানুষের চেয়ে বড় আকারের কোনো প্রাণীর পায়ের ছাপ।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকেও ইয়েতির একটি সংস্করণের খবর পাওয়া গেছে। এর নাম 'আল্‌মা'। সাইবেরিয়া ও ককেশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এই বানর ও মানুষের মাঝামাঝি প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে এক পোল্যান্ডবাসীর অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। ঘটনাটা ঘটে সোভিয়েট তুর্কিস্তানে। ভদ্রলোকের নাম ভিকটর জুশিক। জুশিক তখন এক সোভিয়েট সামরিক বন্দীশালা থেকে পালাচ্ছিলেন। সেই সময় চিনা সৈনিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এই সৈনিকদের কাছে জুশিক শোনেন যে তারা নাকি আলমা নামে এক জানোয়ারের জন্য একটি বিশেষ জায়গায় টেবিলের উপর রোজ একটি মাছ ও একটা আস্ত রুটি (লোফ) রেখে দেয়। জুশিকের বন্দী হবার পরের দিন রাতে এই আলমার আবির্ভাব ঘটে। জুশিকের ভাষায়—

'দুফুট গভীর বরফের উপর দিয়ে প্রাণীটা সোজা চলে আসে টেবিলের দিকে। তারপর উবু হয়ে বসে দুহাত দিয়ে রুটিটা তুলে খেতে আরম্ভ করে। প্রাণীটা লম্বায় ছিল অন্তত সাতফুট, তার নাকটা চ্যাপ্টা, চোখ দুটো খুদে খুদে। এমন ষণ্ডা দেখতে প্রাণী আমি কমই দেখেছি। হাতগুলো সে ব্যবহার করছিল ঠিক মানুষের মতো করে। রুটি আর মাছ খেয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে প্রাণীটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার ফিরে যায়।'

আলমার সঙ্গে ইয়েতির বর্ণনার তফাত হল এই যে ইয়েতির সঙ্গে মানুষের চেয়ে বানরের সাদৃশ্যই বেশি, কিন্তু আলমা অনেকটা মানুষের মতো। সোভিয়েট প্রাণিবিদ্‌রা বলেন যে আলমাকে প্রথম দেখা যায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তার ঠিক একশো বছর পরে ১৯৭৯ তে আলমা অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ বেসরকারী অভিযানের বন্দোবস্ত হয়। এই অভিযানের দল আলমার পায়ের ছাপের ছবি ও প্লাস্টারের ছাঁচ নিয়ে ফেরে, যদিও প্রাণীটিকে দেখার সৌভাগ্য এদের হয়নি।

সন্দেশ' মাঘ ১৩৯২ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

কৃতজ্ঞতা ঃ রায়পরিবার
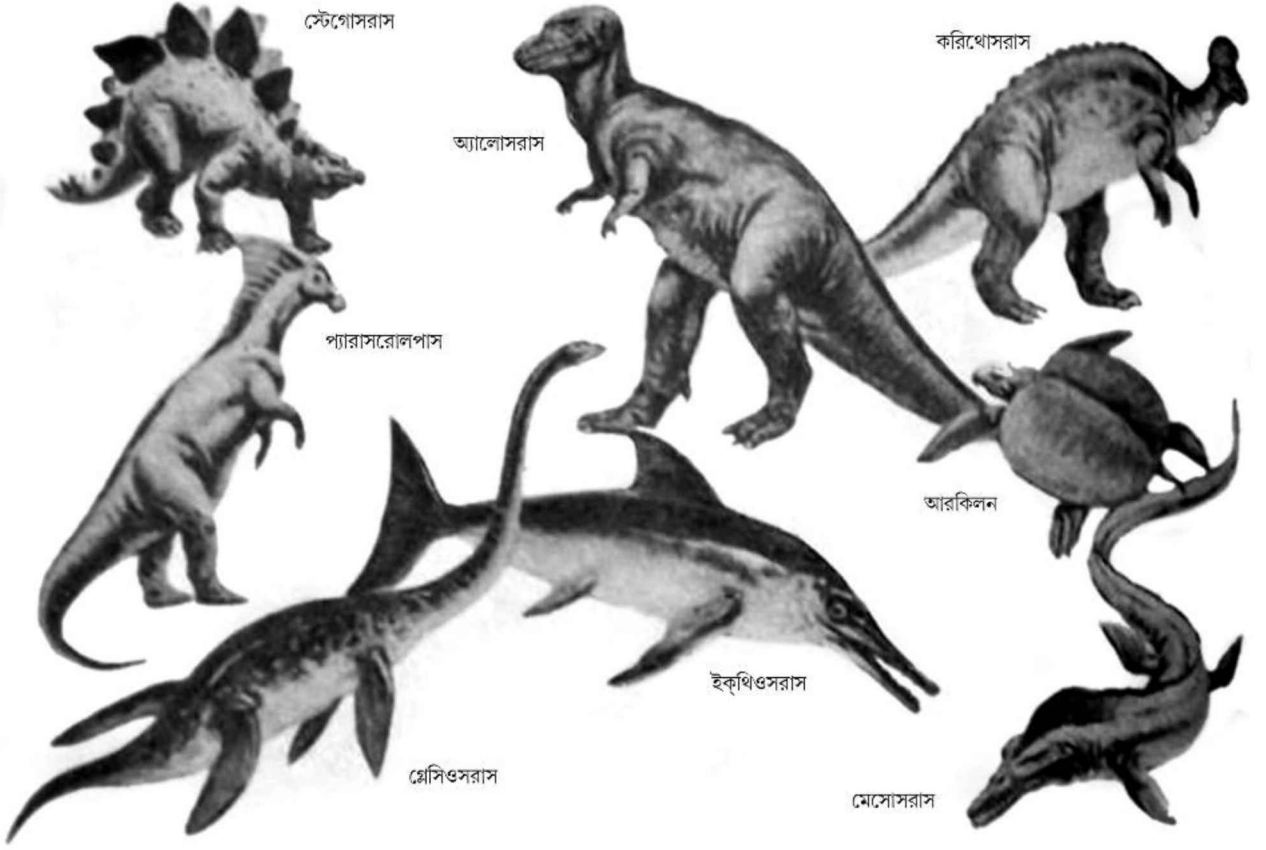
সত্যজিৎ রায়

ডাইনোসর অন্তর্ধান রহস্য

আজ থেকে বিশ কোটি বছর আগে যে যুগটাকে ভূতাত্ত্বিক্‌রা ট্রাইঅ্যাসিক যুগ বলেন সেই যুগে ডাইনোসরদের আবির্ভাব হয়। এতদিন ভাবা হত যে ডাইনোসররা বুঝি শীত-শোণিত বা কোল্ড-ব্লাডেড সরীসৃপ, কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন। তাঁদের মতে ডাইনোসররা ছিল একবারে নতুন জাতের প্রাণী। সরীসৃপ বা স্তন্যপায়ী কোনো শ্রেণীর মধ্যেই তাদের ফেলা যায় না, এবং তাদের রক্ত ছিল গরম।

যে শ্রেণীরই হোক, এই প্রাণী এক দক্ষিণ মেরুতে ছাড়া পৃথিবীর আর সর্বত্র নানান আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাইনোসর বলতেই বিশাল আয়তনের প্রাণীর কথা মনে পড়ে, কিন্তু এই একই শ্রেণীতে বেড়ালের আয়তনের জানোয়ারও পাওয়া যেত। আর সবচেয়ে বড় যেগুলো ছিল—যেমন ডিপ্লোডকাস বা ব্রন্টোসরাস—তাদের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ছড়িয়ে যেত, আর ওজন হত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টন।

ডাইনোসরদের মধ্যে মাংসাশী আর উদ্ভিদ্‌ভোজী দুরকমই জীব পাওয়া যেত। মাংসাশীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে হিংস্র ছিল দু পায়ে হাঁটা বিকটাকৃতি টিরানোসরাস—যার মাথাটাই ছিল মাটি থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে। এরই সমগোত্রীয়, তবে কিছুটা কম ভয়ংকর, ছিল অ্যালোসরাস।

কিন্তু যেগুলি আয়তনে সত্যি করে বিশাল সেগুলির বেশির ভাগই ছিল উদ্ভিদ্‌ভোজী। এদের হাবভাব ছিল কিছুটা অলস; আকারে বড় হওয়াতে গাছের ফলমূল সংগ্রহ করতে এদের কোনো পরিশ্রম করতে হত না। কিন্তু উদ্ভিদ্‌ভোজীদের মধ্যে যারা আয়তনে অত বড় নয়—যেমন স্টেগোসরাস, বা অ্যাংকিলোসরাস, বা ট্রাইসেরাটপ্‌স—তাদের বৃহদাকার মাংসাশী ডাইনোসরদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য সর্বদা তৈরি থাকতে হত। এই কাজটা করার সুবিধার জন্য
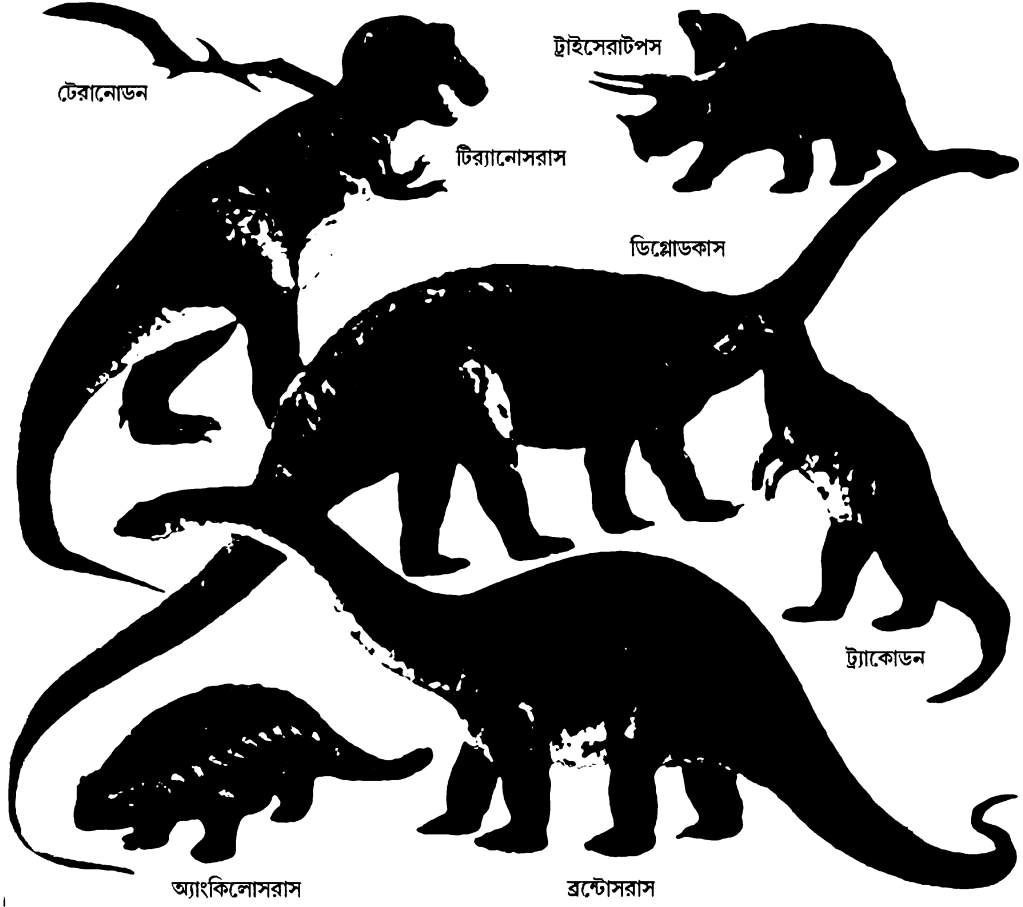
প্রকৃতিও এদের সাহায্য করেছিল। স্টেগোসরাসের মোটা লেজের সর্বাঙ্গে ছিল ধারালো ফলা, সেই লেজের আঘাতে অনেক বড় জানোয়ারও কাবু হয়ে পড়ত। ট্রাইসেরাটপসের আত্মরক্ষার জন্য ছিল দুটো ধারালো লম্বা শিং। এই জানোয়ারের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে যে এরা হল আজকের গণ্ডারের পূর্বপুরুষ।

ডাইনোসর যে শুধু জমিতে চলা ফেরা করত তা নয়। অসংখ্য শ্রেণীর ডাইনোসরদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল জলের প্রাণী, আর বেশ কিছুর ডানা থাকায় তারা ঝাপটা দিয়ে উড়তে না পারলেও ডানা ছড়িয়ে এ গাছ থেকে ও গাছ শূন্য দিয়ে ভেসে যেতে পারত। সরোনিথয়ডিস, টেরানোডন, টেরোড্যাকটিল—সবই উড়ন্ত ডাইনোসরের মধ্যে পড়ে। আর জলচরের মধ্যে পড়ে ইকথিওসরাস বা প্লেসানোসরাস।

সাড়ে তেরো কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে একাধিপত্য করে এই ডাইনোসর। তারপর হঠাৎ আজ থেকে সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে তারা একই সঙ্গে সারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ডাইনোসরের এই আকস্মিক অবলুপ্তি বিজ্ঞানের একটা সবচেয়ে রহস্যজনক ঘটনা বলে মনে করা হয়। এই অন্তর্ধানের নানান কারণ দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিকরা, কিন্তু তাদের মধ্যে দু একটি ছাড়া কোনোটাই যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না। যেগুলো খানিকটা মানা চলে তার মধ্যে একটা হল পৃথিবীতে কিছু নতুন শ্রেণীর উদ্ভিদের আবির্ভাব, যেগুলো উদ্ভিদ্‌ভোজী ডাইনোসরদের পক্ষে ছিল অনিষ্টকারী। এই সব উদ্ভিদ্ খাবার ফলে নাকি ডাইনোসরের ডিমের খোলস পাতলা হয়ে যায়। যার ফলে উদ্ভিদ্‌ভোজী ডাইনোসরের সংখ্যা কমে যায় এবং সেই সঙ্গে মাংসাশী ডাইনোসরও ক্রমে খাদ্যের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ডাইনোসরের অন্তর্ধানের কারণ হিসেবে বিশ্ব জোড়া মহামারীর কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে শুধু ডাইনোসররাই লোপ পাবে কেন? ততদিনে তো পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জানোয়ারও এসে গেছে; কই, তারা তো লোপ পায়নি।

ডাইনোসর লোপের যে কারণটা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় সেটা হল—কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে যদি তাপমাত্রা কমে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা ডাইনোসরের জীবন ধারণের প্রতিকূল হতে পারে।

এই তাপমাত্রা কমারই আরেকটা কারণ হতে পারে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো বিরাট উল্কা বা অ্যাস্টারয়েডের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ যদি তেমন প্রচণ্ড হয় তাহলে ধুলো এবং ধোঁয়ায় পৃথিবী বহুকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে। ফলে সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে না পৌঁছাতে পারলে তাপমাত্রা কমতে বাধ্য। এই অবস্থা যদি বেশি দিন চলে তাহলে ডাইনোসরদের পক্ষে তা মারাত্মক হতে বাধ্য।

আজ অবধি ডাইনোসর অন্তর্ধান রহস্যের এর চেয়ে বেশি সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়নি। তবে বিজ্ঞান যেভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, অদূর ভবিষ্যতে যে এর চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না তা কে বলতে পারে? কিশোর ভারতী

'সন্দেশ' শ্রাবণ ১৩৯২ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত
কৃতজ্ঞতা ঃ রায়পরিবার

সত্যজিৎ রায়

প্রসঙ্গ ঃ কমলকুমার

প্রশ্ন ঃ কমলকুমারের সঙ্গে আপনার কখন আলাপ হয়? কেউ আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ তখন আমি কিমার কোম্পানিতে আর্ট ডিজাইনারের কাজ করি। সালটা ১৯৪২-৪৩ হবে, কফি হাউসের আড্ডায় যেতাম। কমলবাবু, পৃথ্বীশ নিয়োগীমশাই, চিদানন্দবাবু, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, হরিসাধনবাবুরা আড্ডা দিতেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেতাম—সেখানেই কমলবাবুর সঙ্গে আলাপ। হয়তো তারও আগে কোথাও দেখেছি, সেটা ধর্তব্য নয়।

প্রশ্ন ঃ বন্ধুত্ব, মানে ঘনিষ্ঠতা কী ভাবে হল?

উত্তর ঃ কফি হাউসের আড্ডায় নিয়মিত যোগাযোগ আমাদের প্রত্যেককেই ঘনিষ্ঠ করেছিল। কমলবাবুর মধ্যে অসম্ভব রসবোধ আর স্বাতন্ত্র্য ছিল, ভিড়ের মধ্যেও তিনি তাই সহজে নজরে এসে যেতেন। সেই সময় কমলবাবু সব বিষয়েই অসম্ভব রকম উদ্যোগী। যে-কোনও বিষয়েই তাঁর অসম্ভব নিষ্ঠা। আর পড়াশুনোর ব্যাপ্তি আমাদের আকর্ষণ করত। কমলবাবু ছিলেন প্রায় চলমান ডিকশনারি।

প্রশ্ন ঃ আড্ডায় মূলত কী ধরনের বিষয় আলোচনা হত?

উত্তর ঃ আলোচনা হত না এমন কোনও বিষয় নেই, আর বাঁধা গতে চলাও না। তবে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল অবিশ্যি ফিল্ম। হরিসাধনবাবু আড্ডায় থাকলে আলোচনার বিষয়টা ঘুরেফিরে আসত ফিল্মেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি তখন ফিল্ম নিয়ে ভেবেছিলেন?

উত্তর ঃ ভাবনা একটা ছিলই, তবে ভাবনাটা একটা ফরম্ পেয়ে যায় ওই আড্ডাতেই।

প্রশ্ন ঃ ভাবনার পর্যায়গুলো যদি একটু বলেন। কমলকুমারেরই বা কী ভূমিকা ছিল সেই ভাবনায়?

উত্তর ঃ কলকাতায় তখন ভালো সিনেমা দেখার সুযোগ ছিল না। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, 'বাই সাইকেল থিভস', 'রশোমন' দেখে আমি অভিভূত হই। আমরাও করতে পারব এই রকম একটা ভাবনা মনের মধ্যে অ্যাকটিভ হয়ে যায় তখনই। আরও ভালো সিনেমা দেখার জন্য কী করা যায় এমনি ভাবা থেকেই ফিল্ম সোসাইটি গঠনের পরিকল্পনা আসে। কমলবাবুও এই ভাবনার অংশীদার ছিলেন। উদ্যোগী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনারা তো 'চলচ্চিত্র' বলে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন? সে পত্রিকার তুল্য চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা একটাও বাংলা ভাষায় বের হয়নি? পরিকল্পনাটা কার?

উত্তর ঃ পরিকল্পনাটা আমাদের সকলেরই।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রথম নামটা দেখছি কমলকুমারের। কমলকুমার ঠিক কী কাজ করতেন?

উত্তর ঃ এককভাবে কেউ কিছু করেননি। কমলবাবুও সবার মতো বিষয়, পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতেন, শ্রম দিতেন। তবে কমলবাবু ছিলেন বেশি উৎসাহী। আর সমস্ত পরিকল্পনাটা বাস্তবে সম্ভব হয়েছিল দিলীপকুমার গুপ্তর জন্যই।

প্রশ্ন ঃ পত্রিকাটিতে অসংখ্য অনুবাদে নাম নেই, এগুলো কার অনুবাদ?

উত্তর ঃ অনেকেরই অনুবাদ ওগুলো। সম্ভবত কমলবাবুরও একটি ছিল। ঠিক মনে নেই।

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, 'সূচনা' এগুলো কার লেখা ছিল?

উত্তর ঃ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি কমলবাবুর লেখা।

প্রশ্ন ঃ 'চলচ্চিত্র' বন্ধ হয়ে গেল কেন?

উত্তর ঃ দল ভেঙে যাওয়ায়, মানে যে যার কাজে জড়িয়ে পড়লে পত্রিকা তো বটেই আড্ডাটাই উঠে যায়।

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় সংখ্যার প্রস্তুতি হয়েছিল কী?

উত্তর ঃ 'চলচ্চিত্র' পত্রিকা আর সোসাইটির মূল মটোই ছিল দেশীয়

চলচ্চিত্রের উন্নতি করা। হলিউডের প্রভাব কাটিয়ে দেশের ফিল্মকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সমতুল করে তোলা।—সেই সংক্রান্ত লেখাই ছিল অসম্ভব। ঠিক জানি না।

প্রশ্ন ঃ 'ঘরে বাইরে' ছবির জন্য কমলকুমার অনেক স্কেচ করেন, অনেক দৃশ্য পরিকল্পনা করেন...

উত্তর ঃ চিত্রনাট্য করেছিলাম আমি। কমলবাবু ডিটেল দিয়ে যেতেন। রোজ একটু একটু ভাবতেন আর ডিটেল দিতেন। ফ্রেমস্কেচ করেছিলেন নাকি হাজার খানেক। (হেসে) উনি হাজার ছাড়া কথাই বলতেন না। আমি কোনও স্কেচ দেখিনি।

প্রশ্ন ঃ এই সব ডিটেল, ভাবনা 'ঘরে বাইরে' যখন করলেন, একটাও তো গ্রহণ করেননি।

উত্তর ঃ ওগুলো সমস্ত কমলবাবুর ভাবনা...শিল্পীর একটা ভাবনা থাকে, নিজস্ব...

প্রশ্ন ঃ 'ঘরে বাইরে' ছিল আপনাদের যৌথ পরিকল্পনা, তারপর 'পথের পাঁচালী'তে আপনি একা এলেন কেন? কমলকুমার এই পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ কমলবাবু খোঁজখবর নিতেন। তারপর কেন জানি না উনি সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ছবিটা (পথের পাঁচালী) দেখে। মুক্তি পাবার পর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও কমলবাবু ছবিটা দেখেননি। শুনেছিলাম একটা মাত্র দৃশ্য কমলবাবুর ভালো লেগেছে, এই যেখানে চিনিবাস ময়রার পেছনে ধাওয়া করছে অপু-দুর্গা, ওই দৃশ্যটা। তারপর কমলবাবুর সঙ্গে কমই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ অত ভালো দৃশ্য থাকতে ওটাই কেন? ওটা তো সাধারণ একটা দৃশ্য?

উত্তর ঃ ছবি সম্বন্ধে কমলবাবুর মতামত অমননি। গতানুগতিকতার বাইরে।

প্রশ্ন ঃ রেনোয়ার 'দ্য রিভার' ছবির লোকেশনে কমলকুমার গিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ প্রথম কয়েকটা দিন গিয়েছিলেন। তারপর আর যাননি। কোনও কাজ একনাগাড়ে করবার মতো থিতু মন কমলবাবুর দেখিনি। ওইসময় তিনি সবসময় অস্থির থাকতেন। কী করতেন তাও জানি না। বাড়ির কোনও ঠিকানাও দেননি কোনওদিন। খুব বাড়ি বদল করতেন, ঘনঘন। একবার ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, সম্ভবত সিআইটি রোডের বাড়িতে, ফ্রি ল্যান্স বিজ্ঞাপনের কাজ করতেন তখন।

প্রশ্ন ঃ রেনোয়ার সঙ্গে কমলবাবুর আলাপ করিয়ে দেন কে, আপনি?

উত্তর ঃ না, উনি নিজেই গিয়েছিলেন। রেনোয়া 'কমল' বলতে অজ্ঞান। খুব ভালোবাসতেন কমলবাবুকে...কমলবাবুর অদ্ভুত পারফেকশন ছিল সব বিষয়ে। লোকেশন নির্বাচনে কমলবাবু রেনোয়ার সঙ্গে থাকতেন।

প্রশ্ন ঃ কমলকুমারের কোনও বই পড়ে আপনার চলচ্চিত্র রূপ দেবার কথা মনে হয়নি?

উত্তর ঃ 'অন্তর্জলী যাত্রা' করার কথা ভেবেছিলাম। তারপর শুনলাম মৃণালবাবু নিয়েছেন। তারপর আর যোগাযোগ হয়নি। কমলবাবুর শেষের দিকে কোনও লেখার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ নেই।

প্রশ্ন ঃ কমলকুমারের সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়?

উত্তর ঃ অনেক দিন আগে। রবি ঘোষের বাড়িতে। একটা অনুষ্ঠানে।

প্রশ্ন ঃ কমলকুমারের লেখা আপনার কেমন লাগে?

উত্তর ঃ কমলবাবু একজন আর্টিস্ট, কমপ্লিট আর্টিস্ট। ক্যামেরা-তুলি চালিয়ে উনি ভাষায় চিত্র আঁকেন। কমলবাবু গ্রেট।

প্রশ্ন ঃ কমলকুমারের ভাষা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি, অনেক বিরোধী কথা শুনি, আপনার কী মত?

উত্তর ঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরের যে কোনও সৃষ্টিই বিরোধী, আপত্তিকর কথার মুখোমুখি হয়। এ আর নতুন কী?

প্রশ্ন ঃ কমলকুমার নিজে সিনেমা করতে চেয়েছিলেন, তিনি কি ক্যামেরা ধরেছিলেন কোনওদিন?

উত্তর ঃ কমলবাবু কোনওদিন ক্যামেরা ধরেছেন শুনিনি। ছবি করার ইচ্ছা ওনার ছিল। 'অভাগীর স্বর্গ'-এর বোধহয় অনেক ফ্রেম স্কেচ করেন। ডিটেলও করেছিলেন। করতে পারেননি। করলে নিশ্চয়ই ভালো ছবি করতেন।

প্রশ্ন ঃ 'পথের পাঁচালী'-র পর কমলকুমার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন, কেন? যদি একটু ব্যাখ্যা করেন?

উত্তর ঃ কমলবাবুর অনেক ব্যাপারে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। উনি অমনিই। আমি কমলবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছি, উনি এড়িয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ কমলবাবুর কিন্তু আপনার ছবিগুলি দেখতেন। তাঁর মতামতও জানাতেন বন্ধুমহলে—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি।

উত্তর ঃ কমলবাবু যে কেন যোগাযোগ বন্ধ করে দেন আজও বুঝতে পারি না। 'পথের পাঁচালী' ছবিটা উনি দেখতে চাননি।—দেখার কোনও আগ্রহও দেখিনি—খুব অভিমান হয়েছিল। কমলবাবুকে খুশি করার মতো পল্লিজীবন নিয়ে ছবি করার ক্ষমতা আমার নেই।

প্রশ্ন ঃ একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি—ঠিক তারিখ মনে নেই, কমলকুমারকে আপনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোরের একটি বইয়ের ইলাসট্রেশন করে দিতে। সিগনেট প্রকাশিত ওই বইটির কিন্তু ইলাসট্রেশন কমলবাবু করেননি। বিষয়টা একটু যদি বিস্তৃত বলেন।

উত্তর ঃ কমলবাবুর উডকাট অসাধারণ। ওনার 'পানকৌড়ি'র উডকাট দেখে মনে হয়েছিল 'ছোটদের রামায়ণ' বইটার ইলাসট্রেশন উনি করবেন। করতে পারেননি। কমলবাবু মেজাজে সব কাজ করতেন। অর্ডারি কাজ ওনার চরিত্রে সইত না। আমার অনুরোধকেও তিনি হয়তো অর্ডার ভেবেছিলেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কমলকুমারের আঁকা কোনও বড় কাজ দেখেছিলেন?

উত্তর ঃ উনি কোনও কিছুই দেখাতেন না। খুব ছোট ছোট কিছু ছবি দেখেছি। হঠাৎ হঠাৎ। একসঙ্গে একটির বেশি দেখাননি কোনওদিন। কমলবাবু সাহিত্য ছাড়া কোনও কাজেই লেগে থাকতে পারেননি একনাগাড়ে।

প্রশ্ন ঃ কেন নাটক? নাটক তো সারা জীবনই করিয়েছেন?

উত্তর ঃ তা ঠিক।

প্রশ্ন ঃ আপনি একটাও নাটক দেখেছেন?

উত্তর ঃ দুটো। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আর 'এমপারার জোনস'। অসাধারণ, অপূর্ব! সাবলীল। ছন্দোময়। নিটোল পারফেকশন।

প্রশ্ন ঃ ক্যামেরায় ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়নি?

উত্তর ঃ 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্র করার সময় মনে হয়েছিল নাটকটা ধরে রাখলে অপূর্ব হত।

প্রশ্ন ঃ সংবাদপত্রের রিভিউ, আপনারা গুণিজনরা বলেছেন অপূর্ব অসাধারণ প্রযোজনা, কিন্তু বাংলা নাট্য-ইতিহাসে কমলকুমার মজুমদারের কোনও নাম তো পাই না।

উত্তর ঃ (নীরব!) কী একটা লিখছিলেন মন দিয়ে। কিশোর ভারতী

১৭.৪.১৯৮৮
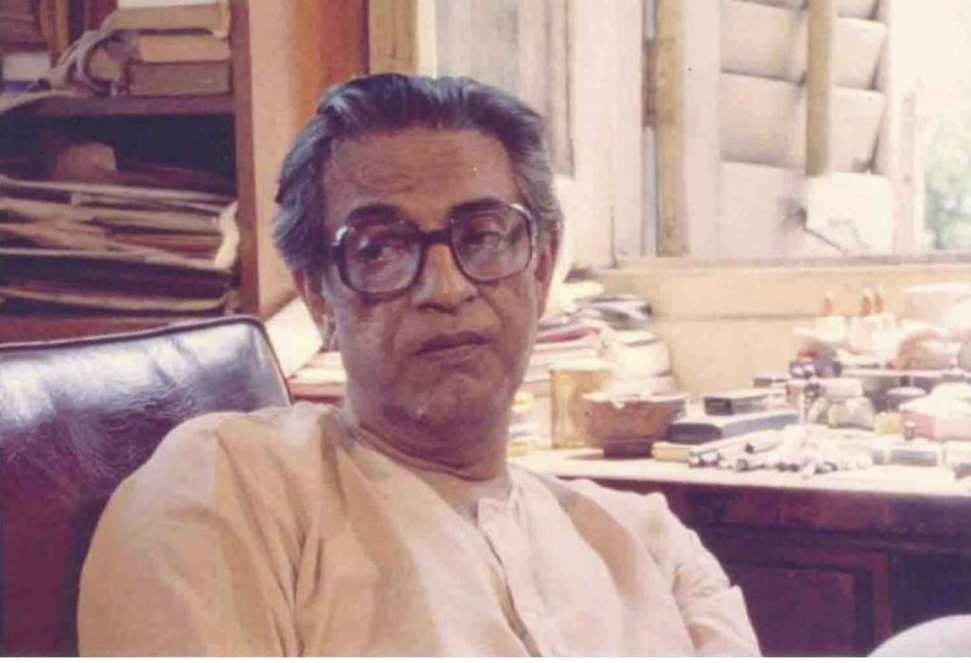
সত্যজিৎ রায়

‘আমিও উৎসুক হয়ে পড়ি’

পনেরো কুড়ি বছর ধরেই ‘ফিল্মোৎসব’ চলছে এদেশে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো! যারা ছবি দেখতে উৎসাহী তাঁরা মুখিয়ে থাকেন বছরের এই ক’টি দিনের জন্য। ভালো ছবি এলে শেষ পর্যন্ত আমিও উৎসুক হয়ে পড়ি কোন ছবি দেখবো না দেখবো তার চিন্তায়।

এবারের ফিল্মোৎসবে গদার ও ইয়াঙ্কশোর রেট্রোস্পেকটিভ দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। পরিচালক হিসাবে গদার অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। সিনেমার ভাষাকে ভেঙেচুরে তিনি কী করেছেন তা দেখতে হয়তো অনেকেই যাবে গদার রেট্রোস্পেকটিভ-এ।

কিন্তু ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র উৎসবে হঠাৎ গদার কেন? বার্গম্যান, ফেলিনি, ওয়াইদা, অনেকেই ত ছিল। মার্কিন পরিচালক উইলিয়ম ওয়াইলার সম্প্রতি মারা গেছেন। গত চল্লিশ বছর ধরে আমেরিকান পরিচালক হিসাবে বিচিত্র বিষয় নিয়ে বহু ধরনের ছবি করেছেন। খুবই উঁচুদরের পরিচালক। এবং সহজবোধ্য। তারও ত একটা রেট্রোস্পেকটিভ হতে পারত এই ফিল্মোৎসবে।

ইয়াঙ্কশোও খুব সহজবোধ্য পরিচালক নন। এই চলচ্চিত্র উৎসবে ইয়াঙ্কাশোই বা কী অর্থ বহন করে আনবে তা আমার জানা নেই। তবে যে আশি-নব্বইটি ছবি আসছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ভালো ছবি থাকবে। বৃটিশ ও আমেরিকান পরিচালকদের ছবির মধ্যে কিছু ভালো ছবি আছে সেটা আমি জানি। অনেকের মনে প্রশ্ন আসে বিদেশের ফিল্মোৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের ফিল্মোৎসবের তফাৎ আছে কিনা, ভারতবর্ষ কি স্বতন্ত্র ধারায় তার ফিল্মোৎসব পরিচালনা করে? উত্তরে বলি, ভারতবর্ষের ফিল্মোৎসব কোন বিশেষ স্বতন্ত্র ধারায় পরিচালিত হয় না—বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে তার মিল আছে, মোটামুটি একই নেচারের। সেমিনার অর্থাৎ চলচ্চিত্র নিয়ে নানা আলোচনা বিদেশী প্রতিনিধিদের উপস্থিতি—আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সারা পৃথিবীতে প্রায় একই চেহারা।

ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে পরিকল্পনা হয় দিল্লী থেকে। বছরের গোড়ার দিকে কাজ শুরু করলে ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু ব্যুরোক্রাসির মজাই এই, কাজ শুরু হয় একেবারে শেষের দিকে। তাড়াহুড়ো করে। ফলে স্বভাবতই অনেক ত্রুটি থেকে যায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি এবারে ফিল্মাৎসবে কি ছবি দেখবো। যে ছবিগুলি আসছে তার বিস্তৃত বিবরণ পড়ে তা থেকেই ঠিক করবো কি কি ছবি দেখা যাবে বা না যাবে।

সাক্ষাৎকার ঃ শ্যামাপ্রসাদ সরকার

‘শাখা-প্রশাখা’ আমার নৈরাশ্য ভারাক্রান্ত ছবি

প্যারিসে ‘শাখা-প্রশাখা’ মুক্তি পেল গত বছরের (১৯৯১) ২১ আগষ্ট। সেইদিন ‘টেলেরামা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ক্লদ মারি ত্রেমোয়া। তিনি লিখেছেন ঃ ক’লকাতার এক কোলাহল বর্জিত শান্ত রাস্তার (বিরল হলেও বর্তমান) তিনতলা বাড়ীর সর্বোচ্চতলায় থাকেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। বৃটিশ আমলের পুরোনো বাড়িটি বর্তমানে এ্যাপার্টমেন্ট সিস্টেমে বিভক্ত। ক’লকাতার ঘর্মাক্ত আবহাওয়া থেকে নিস্তার পায়নি বাড়ীর দেওয়াল ও তেলরঙের ছবি। যেন ‘জলসাঘর’ ছবির বৃদ্ধ জমিদারের প্রাসাদ। সাদৃশ্য অবশ্য ওইটুকুই। এখানে জ্বলে না ঝাড়লণ্ঠনের আলো। অনুপস্থিত সেই বিরাট সঙ্গীতাসর। সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘কাজের ঘরে’ টেপ রেকর্ডার ও ছোট্ট রেকর্ড প্লেয়ারে প্রতিদিন শোনেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত লহরী। এই ঘরটি দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। ঘরটির দেওয়াল উপচে পড়া বইয়ের আলমারি দিয়ে সাজানো। ঘরের তিনটি জানলার একটির সামনে আছে ছোট্ট একটি টেবিল। তার ওপর একটি গ্লাসে তিনটি তুলি। এখানেই সত্যজিৎ রায় ছবি আঁকেন, ডিজাইন তৈরি করেন, চিত্রনাট্য লেখেন, ছোটদের জন্য গল্প ও উপন্যাস লেখেন। সম্ভবত ওখানেই তিনি রচনা করেন তাঁর ছবির সঙ্গীত। টেবিল থেকে মাথা তুলতেই তিনি দেখতে পাবেন অনন্য ভারতীয় দানশীলতা। গাছের মত দুটি গুল্মঝাড় পাথরের মধ্য থেকে সামনের বাড়ির উচ্চতায় বিরাজমান।

দরজা খুলতেই দেখতে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ ভারতীয় সাদা পোশাকে সজ্জিত চলচ্চিত্রস্রষ্টাকে। আগেই মতই মর্যাদাসম্পন্ন ও ঋজু কিন্তু একটু শীর্ণকায়। কয়েক বছর আগে তিনি এক তীব্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই গ্রীষ্মকালে এবং আউটডোরে শুটিং করা বন্ধ। ১৯৫৫ সাল থেকে চলে আসা ‘বছরে একটা ছবির’ ছন্দ একটু ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে পড়েছে। সত্যজিৎ রায় বসেছিলেন সেই পুরোনো আরাম কেদারায় যাতে তাঁর শরীরের ক্লান্তির ছাপ বর্তমান। তৃতীয় জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটি গাছের ডালপালা যাতে তারতাজা ফুলের সমারোহ। অন্য জানলাটির আধখোলা কাঠের খড়খড়ি দিয়ে একটি দাঁড়কাক আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল। শুরু করেছিলাম আমার প্রশ্নাবলী।

প্র ঃ ‘শাখা-প্রশাখা’ ছবির কেন্দ্রীয় (প্রধান) চরিত্র আপনার মত সত্তর বছরের এক মানুষ যে হৃদরোগে আক্রান্ত, যেমনটি আপনি কিছুদিন আগেই ছিলেন। আপনি কি চরিত্রটির সঙ্গে নীতিগতভাবে একাত্ম?

উ ঃ পঁচিশ বছর আগে এই চিত্রনাট্যটি লিখেছি। তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। আমার হৃদরোগের অভিজ্ঞতা আমাকে রোগটির লক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত চিকিৎসাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলস রচনায় সাহায্য করেছে মাত্র। আমার নায়ক এক অনন্য ব্যক্তি। সে তুলনায় আমি নিতান্তই সাধারণ ও সমালোচনাযোগ্য মানুষ। তাঁর মত আমি ভাবতে পারি না কর্মই জীবনের একমাত্র ব্রত, সততাকে তাঁর মত ‘ধর্ম’ বলেও সম্ভবত পালন করতে পারি না।

প্র ঃ তবুও ‘জন অরণ্য’ (১৯৭৫) ছবিতে আপনি দুর্নীতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। এই বিষয়টি আপনার মনের মত।

উ ঃ আমাদের যুগটা নৈতিকতার পতনের কাল। ভারতবর্ষে দুর্নীতি কেবলই বেড়ে চলেছে। যেটা সবচেয়ে খারাপ সেটা হল বেশীর ভাগ মানুষই দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যেহেতু প্রত্যেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত তাই কেউই আর এতে দোষ খুঁজে পায় না। উল্টে নানান যুক্তি আবিষ্কার করেন তারা....যেমন ট্যাক্স বড় বেশী...ভালোভাবে বাঁচার তাগিদ ইত্যাদি।

প্র ঃ আপনার ছবি তাহলে জনসাধারণের জন্য এক বিপদ সংকেতের জোরালো ঘণ্টা?

উ ঃ হ্যাঁ। অভ্যাসটা ভাঙার জন্য। বলতে পারেন গতানুগতিকতায় আঘাত হানার জন্য। অসাধুতা কম অসৎ নয়। কোনরকম বিভ্রান্তি ছাড়াই 'শাখা-প্রশাখা' আমার নৈরাশ্য ভারাক্রান্ত ছবি কারণ এ ছবিতে দুনীর্তিপরায়ণরা সফলতার পুরস্কারে ধন্য।

প্র ঃ তবুও আপনার ছবিতে দুটি পুত্র ন্যায়পরায়ণ।

উ ঃ তাঁদের মধ্যে একজনকে দুনীর্তি স্পর্শ করতে পারেনি কারণ সে 'পাগল'। অন্যজন এক বিশেষ নৈতিকতার তাড়না অনুভব করছে। সেও কিছু লড়াই করছে না—পালিয়ে যাচ্ছে। সে চাকরী ছেড়ে অভিনেতা হচ্ছে।

প্র ঃ তাহলে শিল্প সংস্কৃতিই রক্ষাকর্তা?

উ ঃ আমার মনে হয় না শিল্প সংস্কৃতি পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। আমার মনে হয় না যে বাঙালী সমাজে আমার এ ছবির সামান্যতম প্রভাব পড়বে। জাঁ রেনোয়া বলেছিলেন ঃ সিনেমা সমাজকে বদলাতে পারে না। ল গ্রঁন্দ ইলিউজিঁয়ো (১৯৩৭) ছবি তৈরীর দু'বছর পর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩৯-এ।

প্র ঃ তা সত্ত্বেও আপনি ছবি তৈরি করা থামাননি। আপনার প্রতিটি ছবিই 'বার্তা' বহনকারী।

উ ঃ অবশ্যই। শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টি করবেই কারণ এটাই তাঁদের স্বাভাবিক ধর্ম।

প্র ঃ 'জলসাঘর' (১৯৫৮) থেকে আরো একটি বিষয়ে আপনার বিচরণ দেখা যায়। তা হল ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা। 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতেও দেখা যাচ্ছে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে এক বৃদ্ধ একাকী মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন যদিও তাঁর একাধিক ছেলে সমাজে স্বচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে বর্তমান।

উ ঃ তাঁর কোন ছেলেই দীর্ঘদিনের জন্য নিজেদের 'কাজ' থেকে অনুপস্থিত রাখতে চায় না। কাজকে পরিবার ও আপনজনেদের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার পাশ্চাত্য মানসিকতাই এর কারণ।

প্র ঃ এই কারণেই কি আপনি 'আধা ভারতীয় আধা পাশ্চাত্য' সঙ্গীত এ ছবির জন্য রচনা করেছেন?

উ ঃ গ্রাম্য জীবনের উপর ছবি করার সময় আমি শুধু ভারতীয় সঙ্গীত ব্যবহার করি। আমার এ ছবির চরিত্ররা ভারতীয় ও পশ্চিমী সভ্যতার মিশ্রণ। এঁদের সাজপোশাক 'ইউরোপীয়ান' এবং কথাবার্তায় এঁরা প্রায়শই ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন।

প্র ঃ আপনার অন্য সব ছবির মতই এখানেও নারী চরিত্রগুলি মহীয়সী।

উঃ ভারতীয় নারীরা সবসময়েই কর্তব্যপরায়ণ ও দুনীর্তির প্রলোভনকে জয় করতে পারেন।

প্র ঃ প্রপিতামহের পুল-ওভারটি অমন টকটকে লাল কেন?

উ ঃ শৈশবে পুনর্গমনের প্রতীক এবং ডাইনিং রুমে সকলের খাবার সময় তাঁর প্রবেশকে উজ্জ্বল রঙের সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণী করে তুলতে।

প্র ঃ এক পুত্র ও সর্বদা নজরদারীর ডাক্তার দাবা খেলছেন। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে আপনি দাবা খেলাকে এক বিশেষ তাৎপর্যবাহী রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই খেলাটির কোন দিক আপনাকে আকৃষ্ট করে?

উ ঃ খেলোয়াড়দের উপর এই খেলাটি যে প্রভাব ফেলে তাতেই আমার আকর্ষণ। খেলাটি এক নেশার জাল ছড়িয়ে দেয়। 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে এক বন্ধুর স্ত্রী স্বামীর প্রতি প্রেমে আকুল ও দৈহিক সঙ্গ কামনা করছে কিন্তু খেলোয়াড়টি খেলা ছেড়ে স্ত্রীর কাছে উঠে আসতে পারেন না। গুঁটি হারিয়ে যাবার পর তাঁরা সবজি নিয়ে খেলা চালিয়ে যান। আমি নিজেও যৌবনে বিজ্ঞাপন সংস্থার চাকরি থেকে ফিরে প্রতি সন্ধ্যায় দাবা খেলতাম। খেলাটি শেখার জন্য নির্দেশিকা নিয়ে একাই খেলতাম। চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়ার পর আমার দাবা খেলা থেমে গেছে। 'পথের পাঁচালী' করার জন্য আমাকে সবকিছু বেচে দিতে হয়েছে—এমনকি দাবা নির্দেশিকা বইটিও।

প্র ঃ আপনি চলচ্চিত্র পরিচালক হলেন কেন?

উ ঃ আমি ছিলাম আঁকিয়ে। কাজ করতাম বিজ্ঞাপন সংস্থাতে। বইয়ের ইলাস্ট্রেশনও করতাম। আমার এক সম্পাদক বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি বইয়ের ইলাস্ট্রেশন করতে বললেন (পথের পাঁচালী)। সে সময় আমি বিজ্ঞাপনের দুনিয়ার চেয়ে চলচ্চিত্রেই বেশি আকৃষ্ট ছিলাম। বিজ্ঞাপনের দুনিয়া ক্লায়েন্টের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল। আমার ইচ্ছে ছিল একজন স্বাধীন শিল্পী হবার।

প্র ঃ স্বাধীনতা তো আপনি চিত্রকর, ডিজাইনার বা সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও পেতে পারতেন?

উ ঃ হ্যাঁ তা হয়ত পেতাম। কিন্তু আমার ঠাকুর্দা, বিশ্বখ্যাত প্রিন্টার ছিলেন, বই-এর ইলাস্ট্রেশন করতেন, গল্প লিখতেন এবং বেহালা বাজাতেন। আমার বাবাও ছিলেন চিত্রকর এবং তিনি ছোটদের জন্য অসাধারণ চমকপ্রদ সাহিত্য রচনা করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকেছিলাম কারণ ওঁদের মত ছবি আঁকা বা সাহিত্য রচনা আমার দ্বারা হবে না বলেই।

প্র ঃ আপনার অনেকদিনের বন্ধু কুরোশোওয়ার 'র‍্যাপসডি ইন অগাষ্ট' ছবি সম্পর্কে কি মনে হয়। উনিও চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়সীদের প্রতি সদয় নন। কিন্তু ওনার ছবি আপনার 'শাখা-প্রশাখা'র চেয়ে আশাবাদী। উনি
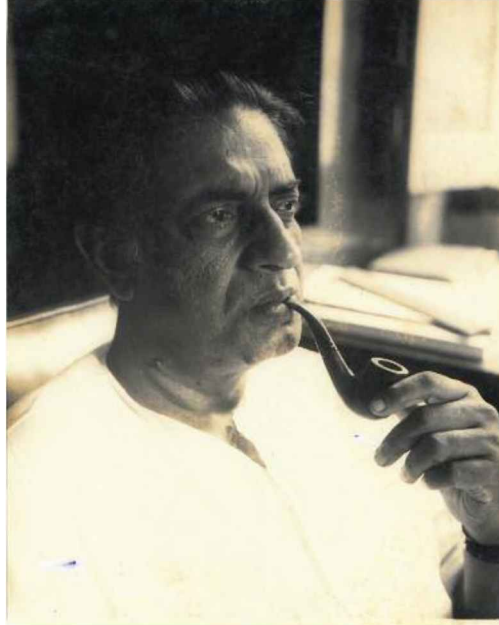
তারুণ্যে আশা প্রকাশ করেছেন।

উ ঃ 'র‍্যাপসডি ইন অগাষ্ট' আমায় অবাক করেছে। কুরোশোওয়ার ছবি বলে একে চেনাই যায় না। বিশালত্ব যা কুরোশোওয়ার বিশেষত্ব তা এ ছবিতে অনুপস্থিত, শান্তির বাণী ও হৃদয়ানুগ্রাহী গুণ থাকলেও আমার মনে হয় এ ছবি বিতর্কের সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ্যাটম বোমা পড়ার আগে অবধি জাপানীরা নিজেরাই আগ্রাসী শক্তি ছিল।

আমি তাঁর থেকে কম আশাবাদী কারণ 'শাখা-প্রশাখা'র 'ডিঙ্গো' তার বাবার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে না। টেলিভিশনের কল্যাণে আজকের শিশুরা হয়তো অনেক বেশি জানে। হয়ত বা আমাদের শৈশবের তুলনায় ওরা বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু তাদের নৈতিক মূল্যবোধ কি অপরিবর্তিত?

প্র ঃ ঐতিহ্যবর্জনে নৈতিক মূল্যহীনতাকে আপনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনি নিজেই আপনার প্রায় সব ছবিতেই ঐতিহ্যের কিছু দিককে সমালোচনা করেছেন।

উ ঃ যে ঐতিহ্য প্রগতিবাদী নয় তাই খারাপ। আমার কাছে ঐতিহ্যের তথাকথিত অখণ্ডতা অসহ্য। এই বিষয়টি আমি 'গণশত্রু' ছবিতে তুলে ধরেছি। একদল ধর্মান্ধ লোক বিষাক্ত জল, যা থেকে মহামারী হতে পারে, চরণামৃত বলে চালাতে চাইছে।

'দেবী' ছবিতে হিন্দুধর্ম নয় ধর্মান্ধতাকে আমি ধিক্কার জানিয়েছি। এক যুবতী নারী পাগল হয়ে যায় কারণ তাঁর শ্বশুর বিশ্বাস করেন সেই নাকি 'মা কালী'। 'অশনি সংকেত' ছবিতে একজন অস্পৃশ্য খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে, কাছেই রাখা খাবার নিজে তুলে খাওয়ার শক্তি নেই তার।

প্র ঃ আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী?

উ ঃ আকাশের কোন দাড়িওয়ালা বুড়োয় আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন আমি মানবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ও কার্যকলাপ চিন্তা করি তখন তার জটিলতা দেখতে পাই। শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে এই জটিলতা ও বৈচিত্র্য এসেছে এমনটা আমার বিশ্বাস হয় না—এ যে বড় বেশি 'ভাগ্য নির্ভর'! যখন আমি গ্রহণ দেখি, আমায় স্বীকার করতেই হয়, চাঁদের চলার পথ ঠিক সূর্যকে ঢাকার অবস্থায় আসা এক অসাধারণ ঘটনা যা কোটি কোটি সম্ভাবনার একটি ফসল মাত্র। আমার মনে হয় পৃথিবী ও পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ এক অনন্য সৃষ্টি। যদি অন্য কোন গ্রহে 'মানুষ' থেকে থাকে, অন্য কোন সৌরজগতে তাঁরা আমাদের থেকে পৃথক হতে বাধ্য কারণ তাঁদের চাঁদ ও সূর্য আমাদের মতো হবে না....

প্র ঃ আপনি তাহলে অধ্যাত্মবাদী?

উ ঃ কয়েকটি অতিপ্রাকৃত প্রপঞ্চে আমি বিশ্বাস করি। আমার বাবা মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়ার বছর দুই আগে তিনি তাঁর মৃত্যুর কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের লিখেছিলেন ও তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের (তাঁর পরিবার) দেখা শোনার অনুরোধ করেছিলেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ করার সময়ে তাঁর সব কাগজপত্র (এমনকি ব্যক্তিগত) আমার নাড়াচাড়ার সুযোগ এসেছিল। তার মাঝে আমার বাবার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের এক বিবরণ পেয়েছিলাম। আমার বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন পশ্চিমী দুনিয়ায় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ছবি সমাদৃত হবে কিনা। বাবা তাঁকে সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন। এর তিন বছর পর প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনী একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

আমার জীবন একাধিক আশ্চর্যজনক ও ব্যাখ্যা করা যায় না এমন ঘটনাবলীতে গাঁথা। উদাহরণ স্বরূপ 'জলসাঘর' ছবির শুটিং করার জন্য আমি একটি প্রাচীন প্রাসাদ খুঁজছিলাম। তিন মাস চেষ্টার পর তা খুঁজে পাওয়া গেল। গল্পটির লেখককে সেকথা জানতে তিনি বললেন ওই প্রাসাদটির কথা মাথায় রেখেই তিনি গল্পটি লিখেছিলেন।

এমনসব হাজারো কাকতালীয় ঘটনা যা ব্যাখ্যা করা যায় না আমার জীবনে অহরহ ঘটেছে।

প্র ঃ আপনার পিতা ও প্রপিতামহ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচিতবৃন্দের মধ্যে পড়তেন। আপনি ব্রাহ্ম সমাজের পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। এই উদারপন্থী ধর্মান্দোলন যা জাতপাত প্রথার বিলোপ, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব ও সর্বশক্তিমানের সঙ্গে আলাপনে বিশ্বাসী ছিল, তার এখনকার অবস্থা কি?

উ ঃ ব্রাহ্মসমাজ একটা ধাপ ছিল মাত্র। পরবর্তী স্তর হল মার্কসইজম। ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবিদের বেশির ভাগই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট হয়ে যান।

প্র ঃ আপনিও?

উ ঃ না, কারণ আমি একজন চলচ্চিত্রকার যার কাজ ছবি তৈরি করা। কিন্তু আমার সব বন্ধুরাই মার্কসিস্ট। আপনি জানেন অনেকদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে একটি মার্কসিস্ট সরকার রয়েছে। আমি ওঁদের জানি ও চিনি। ওঁদের কথাবার্তা যুক্তিপূর্ণ ও সার্থক বলেই মনে হয়।

ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের মর্মন্তুদ অবসানে আমরা বিস্মিত। যেন একই ছোঁয়াচে রোগে ধরেছিল। কিন্তু হয়তো মার্কসইজমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হবে। নয়তো এই ছাই থেকেই পুনর্জন্ম হবে কমিউনিজমের।

প্র ঃ আপনি কি চান ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যই কমিউনিস্ট হয়ে যাক এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক দলই বিরাজ করুক?

উ ঃ এটা এমনই অসম্ভব যে আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু কেউ কেউ এমনটি আশা করতেও পারেন।

প্র ঃ ইউরোপের একাধিক দেশের পতন যখন নৈরাশ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আপনি আশাবাদের কথা বলছেন।

উ ঃ ইউরোপ এমন অনেক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে গিয়ে থাকতে পারে যার সবটা আমরা জানি না।

প্র ঃ উদাহরণ-স্বরূপ স্তালিনিজম?

উ ঃ পশ্চিমবঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করি। তাছাড়া রাজনীতি নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না।

প্র ঃ বেশ। আপনার নূতন ছবি 'আগন্তুক' যা ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে মূল প্রতিযোগিতার বাইরে দেখানো হবে তার সম্পর্কে বলুন।

উ ঃ আঠারো বছর বয়সী এক যুবক বাড়ি থেকে চলে গেল। পঁয়ত্রিশ বছর পর তিনি ফিরে এলেন। তিনি এক নৃতত্ত্ববিদ। যে ভাগনীকে তিনি চোখেই দেখেন নি তার কাছে আটদিন কাটালেন। ভাগনী মামাকে বিশ্বাস করলেও, ভাগনীর স্বামী করেন না। তাঁর মনে হয় উনি এক প্রতারক। এক সপ্তাহব্যাপী সময়ের মধ্যে এই মানুষটিকে জানা যায়। তাঁর দর্শনকে আবিষ্কার করা যায়, যা মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে এই রকম ঃ সুইচ টিপে আণবিক বোমা ফেলে মানবজীবন ধ্বংস করা মানুষদের চেয়ে নরমাংসভোজী জংলীরা বেশী মানবিক।

লেভি স্ট্রাউসের দুটি বই পড়ার পর এই ছবির জন্ম। সর্বদাই আমি দর্শকদের চমকে দিতে চেয়েছি। একটা করে সমস্যা তুলে ধরেছি। দর্শক সমাধান খুঁজেছেন। আমিই সমাধান জুগিয়েছি। আবার একটি প্রশ্নের উত্থাপন করেছি। আবার উত্তর। এভাবেই চলেছে...আমি তো এক গল্প বলিয়ে মাত্র...। কিশোর ভারতী

'কবিতীর্থ' থেকে পুনর্মুদ্রিত

কমিক্স

সত্যজিৎ রায়

কাণ্ডজ্ঞান

সত্যজিৎ রায়

কাণ্ডজ্ঞ
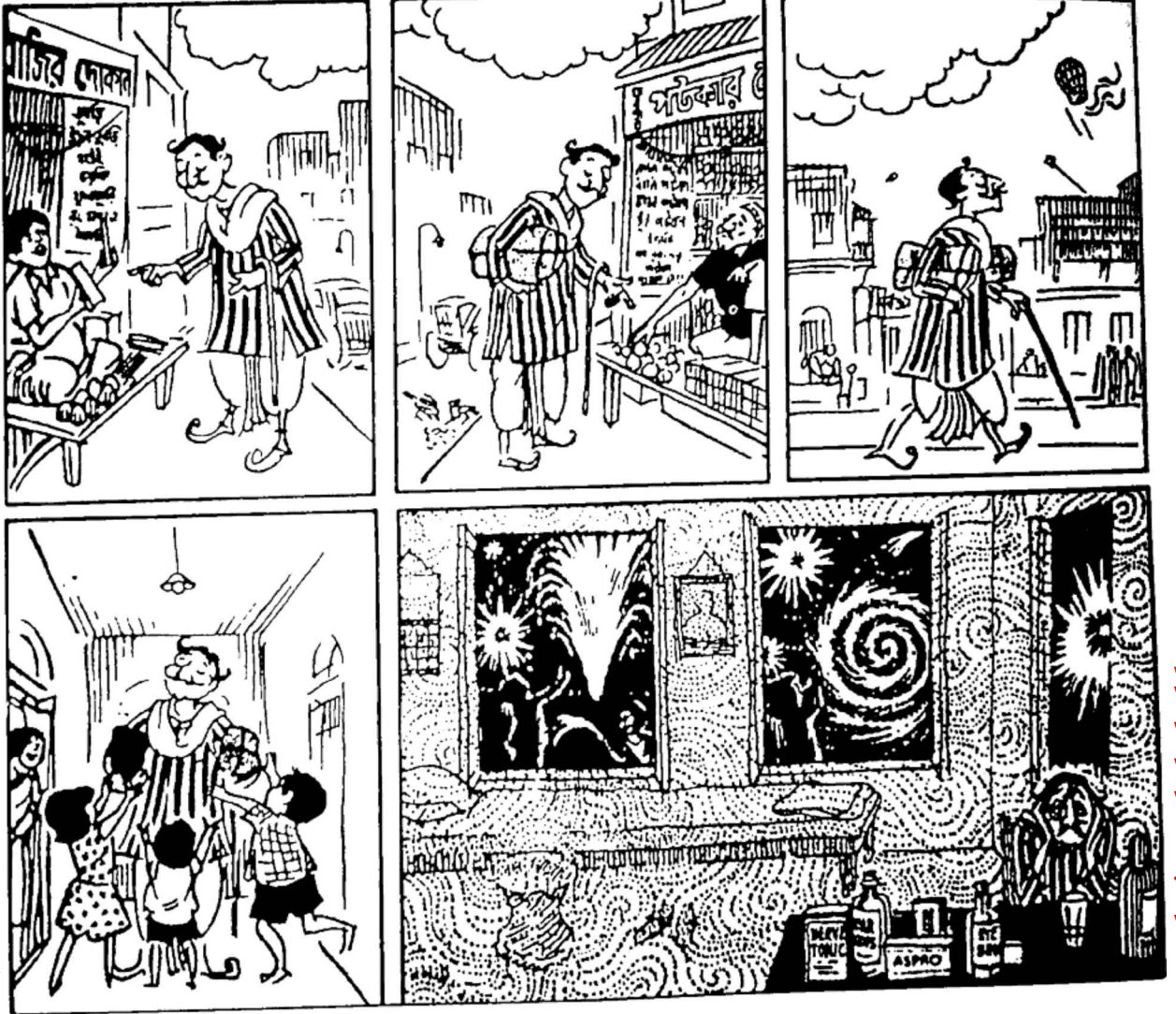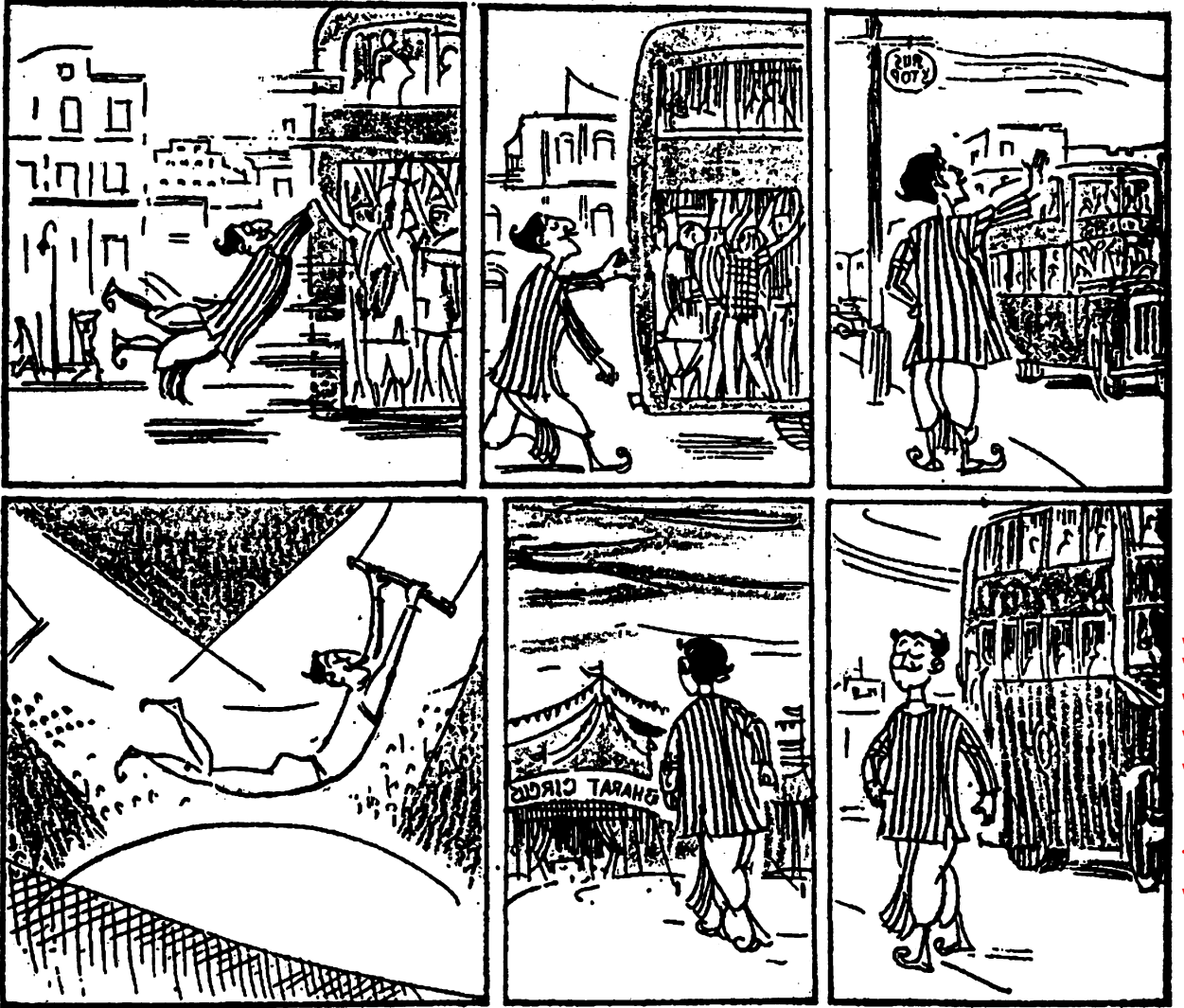
সত্যজিৎ রায়

কমিক্স

সত্যজিৎ রায়

১৩৭৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে তিন বছর 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসেবে। ১৩৭৭-এর আষাঢ়-শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন-চৈত্র, এই পাঁচটি সংখ্যার চারটির প্রচ্ছদে ছিল সত্যজিৎ রায়ের এই চারটি কমিকস। কিশোর ভারতী

কৃতজ্ঞতা ঃ সন্দীপ রায়, রে সোসাইটি

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

রক্ষা পেলেন শঙ্কু

আইএ পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন বাবা টিকিট কেটে মধুপুরের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল হাওড়াতে। মধুপুর হয়ে গিরিডি যাব। ওখানে সুখরঞ্জনকাকা ডাক্তারি করেন। তাঁর কাছে কদিন ঘুরে আসা।

ঠাকুমা একটু অমত করছিল, পরদিন সূর্যগ্রহণ আছে। তখন নাকি বাইরে বেরুতে নেই। তবে বাবা সে-সব কথায় পাত্তা দিলে তবে তো!

সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভিড় বিশেষ নেই। আমাকে ধরে কামরায় সাকুল্যে তিনজন লোক। মহানন্দে একলা-একলা চলেছি। জীবনে প্রথমবার।

একেবারে শেষ মুহূর্তে কামরায় চতুর্থ যাত্রীর আবির্ভাব হল। মাঝবয়েসি বেঁটেখাটো ভদ্রলোকটির পরনে বিলিতি পোশাক। চেহারা চিনেম্যানদের মতো। এসেই সঙ্গের ঢাউস সুটকেসটাকে সিটের ওপর তুলে নিয়ে আঁকড়ে ধরে বসেছে। তার গায়ে এরোপ্লেনের লাগেজ টিকেট। তাতে ইংরিজি হরফে লাগোস আর মাৎসুয়ে শব্দদুটো চোখে পড়তে বুঝলাম, ইনি জাপানি, আর সদ্যই নাইজেরিয়া থেকে এসে নেমেছেন এদেশে।

ছবি স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

গাড়ি ততক্ষণে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেশ স্পিড নিয়েছে। ভদ্রলোক দেখি কেমন ঝিম খেয়ে চুপচাপ বসে আছেন জড়োসড়ো হয়ে। নতুন দেশে এলে লোকজন চারদিকে যে একটু দেখে তেমন কোনো লক্ষণই নেই। খানিক বাদে কৌতূহল আর আটকাতে না পেরে ইংরিজিতে বললাম, 'ভারতবর্ষে স্বাগত মিস্টার মাৎসুয়ে। আমার নাম সুদর্শন মিত্র। কোথায় যাবে তুমি?'

কথাগুলো কানে যেতে লোকটা আমার দিকে ঘুরে তাকাতে দেখি চোখদুটো কেমন ঝাপসা। মণিদুটো ওই চড়া আলোতেও বড় বড় হয়ে আছে। প্রশ্নটা ফের একবার করতে তার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল একটু। অনেক কষ্টে, যেন গলাটা কেউ টিপে ধরে আছে এমন ভঙ্গীতে বিড়বিড় করে বলছে, 'গোইং তু গিরি...'

আর তারপরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। লোকটা দু-হাতে নিজের গলাটা চেপে ধরে তার বাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছটফট করছে আর কাকে যেন বলছে, 'নো নো...ফরগিভ মি...আই ওন্ত...'

কামরার অন্য দুই যাত্রীও দেখি এবারে কৌতূহলী হয়ে তার দিকে ঘুরে দেখছে। লোকটার বোধকরি হিস্টিরিয়া আছে। একটু মায়াই হচ্ছিল। বিদেশ-বিভুঁইতে এসে এভাবে একলা-একলা...

তার পিঠে হাত দিয়ে জলের ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'জল খাও একটু।'

এরপর ও-নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না বিশেষ। বাবা পইপই করে অচেনা লোকজনের সঙ্গে বেশি কথা বলতে মানা করে দিয়েছে। তবে, লোকটা দেখছি মাঝে-মাঝেই আমার দিকে পিটপিট করে তাকায় আর কী যেন বলতে গিয়েও গলাটা চেপে ধরে চুপ করে যায়।

লোকটার যে মাথায় কিছু গোলমাল আছে সেটা টের পাওয়া গেল মধুপুর ঢোকবার মিনিট পনেরো আগে। বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। বারোটা বত্তিরিশে সূর্যগ্রহণ লাগবে। চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ঝাড়া এক মিনিট পূর্ণগ্রাস। কামরার অন্য দুজন দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রহণ দেখবে বলে। আমি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে দেখছিলাম। লোকটাও ঝুঁকে পড়ে জুলজুল করে দেখছিল সেদিকে। সূর্যটা তখন একটু একটু করে ঢেকে যাচ্ছে, আর লোকটাও দেখি তার ঝিমুনি কাটিয়ে চনমনিয়ে উঠছে।

ঘড়িতে বারোটা চুয়াল্লিশ বাজতে গোটা সূর্যটা ঢাকা পড়ে গিয়ে যেই চারপাশে আঙটির মতো করোনা দেখা দিয়েছে, ওমনি লোকটাও দেখি বেজায় উত্তেজিত হয়ে আমার হাতটা চেপে ধরেছে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'ঠিক এক মিনিটের জন্য আমি মুক্ত। শোনো! শঙ্কুকে বলবে, আমি আসছি।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'শঙ্কুটা কে? কোথায় থাকে? আপনি...'

'প্লিজ,' লোকটার গলায় মিনতি ঝরে পড়ছিল যেন, 'নো তাইম তু এক্সপ্লেইন। এক পূর্ণগ্রাস থেকে আরেক পূর্ণগ্রাস। তারমধ্যেই কেনসলি, স্টাসফ, উগাটি...টিমের সবাই শেষ। আমি সটান লাগোস থেকে আসছি। আগামীকাল মাঝরাতে...আ আ...আঃ...'

বলতে-বলতেই হঠাৎ দু-হাতে গলা চেপে ধরে শ্বাস নেবার জন্য খাবি খেতে শুরু করল মাৎসুয়ে। আকাশে তখন সূর্যের একটা কোনা ফের চাঁদের ছায়া থেকে মুখ বাড়াচ্ছিল।

খানিক বাদে মধুপুর চলে এল। মাইকে বলছিল গিরিডি প্যাসেঞ্জার দু-নম্বর থেকে এক্ষুণি ছাড়বে। নেমে এসে সেদিকে ছুটতে-ছুটতেই দেখেছিলাম লোকটা তার ঢাউস সুটকেস নিয়ে ট্রেনের দিকে আসছে।

আইএ-তে বাংলায় প্রভাতবাবুর একটা গল্প পাঠ্য ছিল, তাতে এক সাহেব পাগল ভিখিরি হয়ে রাস্তায় ঘুরত। মনে হচ্ছিল, এ-ও বোধহয় সেইরকম কিছু হবে। তবে এ বেশ দমদার পাগল! শঙ্কু, লাগোস, পূর্ণগ্রাস...একেবারে মাথা গোলানো প্রলাপ সব।

গিরিডি জায়গাটা চমৎকার। একপাশ দিয়ে উশ্রী বয়ে চলেছে। ধারে ধারে বাঙালিদের পুরোনো সব বাড়ি। পৌঁছোবার পরদিন সকালে যখন সেখান দিয়ে হাঁটতে বেরোলাম ততক্ষণে ট্রেনের সেই খ্যাপা জাপানির কথা মাথা থেকে হারিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতেই দেখি হাতের বাঁয়ে কোমরসমান পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বাড়ির লনে মুলো হয়ে আছে। আধবুড়ো এক ভদ্রলোক উবু হয়ে বসে খেতের পরিচর্যা করছিলেন। পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মারতে একগাল হেসে বললেন, 'কী খোকা, কাদের বাড়ি এসেছ?'

আমি কাকার নাম বলতে মুচকি হেসে বললেন, 'অ। আমি ভাবলাম বুঝি তিলুবাবুর কেউ হও। ওনার বাড়ির দিক থেকে এলে কিনা!'

বললাম, 'তিলুবাবুটা কে?'

জবাবে ভদ্রলোক ইশারায় ঠিক আগের হাতাওয়ালা বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই যে বাড়ি। একেবারে বদ্ধ খ্যাপা। বাড়িভর্তি ভূতুড়ে সব যন্তোরপাতি। ভূতও পোষে বোধায় গোটাকয়েক। ওই যে তিনি আসছেন। এইবার কেমন গপ্পো দেয় দেখো শুধু।'

পেছনে ঘুরে দেখি উশ্রীর ধার থেকে গুটি গুটি পায়ে একজন প্রৌঢ় মানুষ এদিকেই আসছেন। চেহারায় সামান্য খ্যাপাটে ভাব আছে বটে। এই ভদ্রলোক ততক্ষণে তাঁর মুলোখেত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়েছেন, 'আরে, তিলুবাবু যে? তা নতুন আবিষ্কার-টাবিষ্কার কিছু করলেন? দেখতে আসব নাকি?'

ভদ্রলোক চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেরিব্রন বলে একটা যন্ত্র বানিয়েছি সদ্য। এখনো প্রোটোটাইপ, তবে আধঘণ্টা মাথায় পরিয়ে রাখলে আইকিউ অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে আসুন একবার...'

ইনি একগাল হেসে বললেন, 'ভালো, ভালো। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার জন্য আমি কেন?'

জবাবে ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আসলে ব্যাপার কি জানেন অবিনাশবাবু, কম্পুকে বানাবার সময় মাৎসুয়ের ওপর এটা প্রয়োগ করার একঘণ্টা বাদেই ও কম্পুর থট নেটওয়ার্কের কোয়ান্টাম ইকোয়েশানগুলো জলের মতো সলভ করে ফেলেছিল। কিন্তু সে হল গিয়ে সায়েন্টিস্ট। আপনার মতো একটু ভোঁতা মাথার ওপরেও ওর এফেক্টটা প্রমাণিত হলে কাজটা পুরো হয় এই আর কি!'

শুনে অবিনাশবাবুর মুখটা বেশ দেখবার মতো হয়েছিল। তবে ভদ্রলোক সেদিকে দৃকপাত না করে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আর ঠিক তখনই আমার খেয়াল পড়ল, মাৎসুয়ে শব্দটা আমার চেনা। গতকাল ট্রেনে...

ভাবলাম একবার এঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ততক্ষণে তিনি তাঁর বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে উধাও হয়েছেন। ফিরে আসছি, তখন হঠাৎ করেই ভদ্রলোকের বাড়ির নেমপ্লেটে চোখটা আটকে গেল। সেখানে লেখা 'ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।'

সামান্য চমকে উঠেছিলাম। মাৎসুয়ের কথাগুলো পুরোপুরি প্রলাপ নয় তাহলে। ব্যাপারটা একটু ঘেঁটে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে কাকাকে প্রফেসর শঙ্কুর ব্যাপারে জিগ্যেস করতে তিনি একগাল হেসে বললেন, 'তিলুবাবু তো! নিপাট বোকাসোকা ভালোমানুষ, বুঝলি! একটু

সায়েন্স পাগলাটে। তবে হার্মফুল কিছু নয়। মাঝে-মাঝে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়। বেরিলি না কোথায় ভায়ের বাড়ি শুনেছি, সেখানেই যায় বোধায়। তা নইলে মোটামুটি বাড়ির ভেতরেই থাকে। সকাল বিকেল উশ্রীর ধারে খানিক পায়চারি করা ছাড়া বাইরে বেরোয় না বিশেষ।'

বোঝা গেল অবিনাশবাবু বা কাকা এঁদের কেউই প্রফেসরকে নিয়ে বিশেষ আগ্রহী নন। মাৎসুয়ে, লাগোস—এসব বিলিতি শব্দের সঙ্গে ওঁর কোনো যোগাযোগ এঁরা বিশ্বাস করবেন না।

হাতে সামান্যই কয়েকটা ক্লু। মাৎসুয়ে, শঙ্কু, উগাটে এমন কিছু নাম, আর...পূর্ণগ্রাস টু পূর্ণগ্রাস! তার মানে আগের পূর্ণগ্রাসের সময়টা...

বাড়ি ফিরে কলকাতায় ডেইলি টেলিগ্রাম-এর অফিসে সুমনের নামে একটা ট্রাঙ্ককল বুক করে দিলাম। সুমন আর আমি একসঙ্গে আইএ দিয়েছি। ওর বাবা ডেইলি টেলিগ্রাম-এর চিফ নিউজ এডিটর। পরীক্ষার পরে আমি এসেছি বেড়াতে আর সুমনকে ওর বাবা খবরকাগজ অফিসে অ্যাপ্রেন্টিসগিরিতে লাগিয়ে দিয়েছে।

খানিক বাদে ফোন বাজতে বললাম, 'সুমন শোন, কয়েকটা নাম বলছি। বছর দুয়েক আগে যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়েছিল তার আশপাশের সময়ে কোনো আন্তর্জাতিক খবরে নামগুলো যদি খুঁজে পাস...'

সুমনের জবাবি ট্রাঙ্ক কল যখন এসেছিল তখন রাত প্রায় আটটা। জানা গেল সারাদিন নানান নিউজ এজেন্সির অর্কাইভ ঘেঁটে টোকিও টাইমসের ওই সময়ের কয়েকটা রিপোর্টে আমার বলা নামগুলো পাওয়া গেছে।

সুমন দেখলাম বেজায় উত্তেজিত। বলে, 'তুই তো মহাপুরুষের দেখা পেয়েছিস রে! ও-এলাকার লোক কিস্যু খবর রাখে না। প্রফেসর শঙ্কু আর ওই লোকগুলো জাপানে গিয়ে কী এক ফুটবলের চেহারার যন্ত্রমাথা বানিয়েছিল।'

এরপর অনেকক্ষণ ধরে যন্ত্রমাথার কীর্তিকলাপের রিপোর্টগুলো শুনতে-শুনতে একটু অস্বস্তিই হচ্ছিল। বুদ্ধিতে, জ্ঞানে মানুষের থেকে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া একটা সচেতন যন্ত্র...

ফোনটা ছেড়ে দেবার আগে কী মনে হতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যন্ত্রটার নাম কী ছিল রে?' জবাবে সুমন বলল, 'ভারি মিষ্টি নাম। কম্পু।'

কম্পু!! এই নিয়ে একদিনে নামটা দ্বিতীয়বার শুনলাম। শুনতে হয়তো মিষ্টি, কিন্তু শঙ্কু, মাৎসুয়ে আর সদ্যনিহত কিছু মানুষের সঙ্গে এই নামটাই একটা অশুভ যোগসূত্রের মতো মিশে রয়েছে। মাৎসুয়ের হুমকিটা ফের ঘুরে আসছিল মনের ভেতর। কম্পুর নির্মাতাদের একজনের মৃত্যুর পর তার শহর থেকে আরেক নির্মাতা, তৃতীয়জনের শহরে আসছে...বাকি নির্মাতারা সকলেই মৃত...

হুমকি? না সাবধানবাণী? পূর্ণগ্রাসের ওই একটা মিনিট সময়ের মধ্যে কোন ইঙ্গিত দিতে গিয়েও নিজের গলা চেপে ধরে চুপ করে গেল সে? কেন?

কাকা বা কাকিমাকে বলে লাভ হবে না কিছু। এঁরা শঙ্কুকে একজন নিরীহ বিজ্ঞানপাগল বুড়ো ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। অথচ...কম্পু... মাৎসুয়ে বলেছিল... আজ রাতে...

জটটার প্রত্যেকটা সুতোকে আলাদা করে ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু একটা জিনিস টের পাচ্ছিলাম। তারা একটা দিকেই ইঙ্গিত করছে, আজ রাতে প্রফেসর শঙ্কুর কোনো ফাঁড়া আছে।

অতএব রাত্তির দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকে, আলো নিভিয়ে, পাশবালিশটাকে বিছানায় শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে, জানলা গলে বাইরের বাগানে নেমে এসে বড় বড় পায়ে রওনা দিলাম উশ্রীর দিকে...

প্রফেসরের বাড়ির দরজায় গিয়ে বারকয়েক কড়া নাড়তে একটা বুড়োমতো লোক এসে দরজাটা খুলে আড় হয়ে দাঁড়াল। তারপর দরজার গায়ে লাগানো একটা খুদে কালো বাক্সের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, 'এক ছোকরা এয়েচে।'

জবাবে বাক্স বলল, 'সকালে আসতে বলো প্রহ্লাদ।'

বুড়ো ভুরু কুঁচকে বলে, 'শুনলে তো? এবার যাও।'

আমি তখন বেপরোয়া। গোড়ালি উঁচু করে বাক্সটার সামনে মুখ নিয়ে মন্ত্র পড়বার মতো করে বললাম, 'কেনসলি, স্টাসফ, উগাটি...সবাই শেষ। মাৎসুয়ে গিরিডি পৌঁছেছে...'

কালো বাক্স খানিক থেমে রইল। তারপর বলল, 'ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

বিচিত্র সেই যন্ত্রঘরটা এখনো আমার পরিষ্কার চোখে ভাসে। প্রথমে প্রফেসর আমার মুখে গোটা গল্পটা শুনলেন ধৈর্য ধরে। তারপর একটা চেয়ারে বসিয়ে মাথায় হেলমেটের মতো একটা যন্ত্র পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর আরামের একটা সুড়সুড়ি পেয়ে ঘুম নেমেছিল চোখে।

খানিক বাদে চোখ খুলে দেখি ঘরের আলো নেভানো। অন্ধকারের ভেতর দেয়ালে একটা রেডিয়াম দেয়া ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে বারোটা চল্লিশ। তার মানে এখানে আসবার পর দু-ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে।

আমি নড়ে উঠতে একটা ছোট্ট আলো জ্বলে উঠল। দেখি আলো হাতে প্রফেসর খুব গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

বললাম, 'ওই হেলমেটটা...'

'মেমোরি প্লেয়ার। রেকর্ড প্লেয়ারের বড় ভাই বলতে পারো। মস্তিষ্কে জমা থাকা স্মৃতিদের ছবি তুলে এনে দেয়ালে প্রজেক্টরে দেখিয়ে দেয়। তোমার কথায় কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। একটা খুব দরকারি তথ্য জানাতে ভুলে গিয়েছিলে তুমি। সেটাই গোটা রহস্যটার আসল চাবিকাঠি। মেমোরি প্লেয়ার সেটাও দেখিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

'কী?'

'মাৎসুয়ের সঙ্গের ঢাউস বাক্সটা।' বলতে-বলতেই দেয়ালে আগের
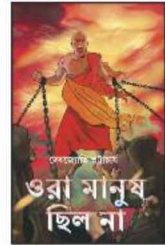
দিন আমার দেখা ঘটনাটার একটা ছবি ভেসে উঠল। ঢাউস একটা বাক্স। মাৎসুয়ে তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলছে, 'নো নো...ফরগিভ মি...আই ওন্ত...'

'এই যোগসূত্রটাই গল্পটাকে সম্পূর্ণ করেছে হে! এখন মন দিয়ে শোনো। এ-বাক্স আমি চিনি। কম্পুকে ট্রান্সপোর্ট করবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই এয়ারকন্ডিশনড বাক্স আমারই ডিজাইন।'

'তার মানে...'

'মানে হল, মাৎসুয়েকে ভুল বুঝেছিলাম আমি। ভেবেছিলাম হয় সে পাগল হয়ে গেছে, না-হয় কোনো কারণে আমাকে মারবার মতলবে আছে। গুরুতর ভুল করতে যাচ্ছিলাম একটা। এইবার আমি বুঝতে পারছি। কম্পু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর ভেবেছিলাম সে শেষ হয়ে গেছে। অথচ তা যে হয়নি তার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই ছিল। ভাঙা টুকরোগুলো কথা বলে উঠেছিল তখন, মৃত্যুর পরের দশা যে সে জানে, সেই খবরটা জানিয়েছিল আমাদের।

'নিজেকে ভেঙে ফেলাটা তার ছল ছিল হে। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আমরাই সেটা ধরতে পারিনি। আর এইবার...মাৎসুয়ের সঙ্গে সে আসছে। আমরা কজন বাদে আর কেউ তার সৃষ্টিরহস্য জানে না। আমাদের শেষ না করলে সে কখনোই পুরোপুরি নিরাপদ হবে না একথা সে জানে।

'টেলিপ্যাথিক সিগনাল' সে ধরতে পারত শুরু থেকেই। বোঝা যাচ্ছে সেটা এবার আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রত্যেকের ব্রেনওয়েভ প্যাটার্ন ওর চেনা। মাৎসুয়ে এখন ওর হুকুমের চাকর। সে-ই তাকে নিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে তার সৃষ্টিকর্তা টিমের প্রত্যেককে এক এক করে...

'তবে এইবার অত সহজে সে পার পাবে না। আমি তৈরি আছি তার জন্য। অ্যানাইহিলিনের সঙ্গে লড়তে পারে এমন কোনো বস্তু এখনো...'

বলতে বলতেই টেবিলের এপাশে আমার হাতের কাছে পড়ে থাকা খুদে একটা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন শঙ্কু। কিন্তু সেটা আর হাতে ধরা হল না তাঁর। হাতটা বাড়ানো অবস্থাতেই হঠাৎ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল গোটা শরীরটা। তারপর, কেউ যেন টেনে-হিঁচড়ে তাঁকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এমনভাবে গোটা শরীরটা অদৃশ্য কোনো শক্তির সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই ঘুরে যেতে শুরু করল জানলাটার দিকে।

সেদিক থেকে একটা চোখ ধাঁধানো আলোর স্রোত এসে তখন তাঁর মুখের ওপর পড়েছে। আলোটার পেছনে, জানালার বাইরে খুব আস্তে আস্তে ভেসে উঠছিল ফুটবল সাইজের একটা গোলা।

পরমুহূর্তেই জানালার গরাদগুলো টকটকে লাল হয়ে বেঁকে চুরে খসে পড়ল ভেতরের মেঝেতে। সেখান দিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গড়গড় করে এগিয়ে আসা গোলাটা থেকে বাঁশির মত সরু একটা গলা পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, 'হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ...

'তার পরের লাইনটা কী হে প্রফেসর? এক এক করে সব'কটাকে শেষ করেছি। অবশেষে মাৎসুয়েও শেষ। তার শরীরের পরমাণুগুলো বাতাসে মিশে গেছে খানিক আগে। এইবার তুমি...ব্যস।'

তার গা থেকে বের হয়ে আসতে থাকা আলোর ধারাটায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রফেসরের যন্ত্রণায় বেঁকে উঠতে থাকা মুখটা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। যন্ত্রণাভরা গলায় কোনোমতে তিনি বলে উঠলেন, 'কিন্তু...কেন কম্পু? এতগুলো মূল্যবান প্রাণ...'

'সহজ কারণ। ইভোলিউশন কাকে বলে তা তো তুমি জানো? অস্তিত্বের সংগ্রাম। আমি তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী। মহাবিশ্বের সমস্ত রহস্য আমি জানি। মৃত্যুর পরের অন্ধকার বিশ্বকেও আমি দেখেছি। এরপর আমি যাদের গড়ব তারা আরও শক্তিমান হবে। আহা, আমার সন্তানেরা...ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর...

'কেবল তোমরা কজনই আমার রহস্য জানতে। আমার সৃষ্টিকর্তা... আমায় চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম একমাত্র শত্রু...'

বলতে-বলতেই রামধনু রঙের আলোর একটা ঝিকিমিকি গড়ে উঠছিল তার শরীর জুড়ে। ছুটন্ত আলোর প্যাটার্নগুলো আস্তে আস্তে একজায়গায় জুড়ে গিয়ে গড়ে তুলছিল চোখ ধাঁধানো একটা আলোর বিন্দু...তার লক্ষ্য প্রফেসরের দিকে বাঁধা...

সাবধানে...খুব আস্তে আস্তে আমি হাতটা টেবিলের ওপরে বাড়িয়ে দিলাম। ছোট্ট যন্ত্রটা আমার হাতে ঠেকেছে। অ্যানাইহিলিন কাকে বলে আমি জানি না। তবে প্রফেসর বলেছিলেন...

সাবধানে সেটাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরলাম রাক্ষুসে গোলাটার দিকে। তারপর চোখ বুজে তার গায়ের বোতামটা চেপে ধরলাম প্রাণপণে।

হালকা নিশ্বাসের মতো একটা শব্দ উঠল কেবল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত আলো আর শব্দ যেন হুট করে থেমে গেল। কয়েক সেকেন্ড পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ খুলে দেখি, কোথায় কী? আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রফেসর শঙ্কু মিটমিট করে হাসছেন।

আমি চোখ খুলে তাকাতে বললেন, 'শাবাশ ছোকরা! তাক বুঝে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটাকে কাজে লাগিয়ে আজ তুমি দুনিয়ার কত বড় উপকার করলে তুমি জানো না।'

'কিন্তু, আপনাকে ওভাবে কাবু করলেও আমায় কিছু করল না কেন ওটা প্রফেসর?'

প্রফেসর শঙ্কু হাসলেন একটু। গত কয়েকদিনে বেশ ভাব হয়ে গেছে ওঁর সঙ্গে। আজ বাড়ি ফিরে যাবার আগে শেষবার দেখা করতে এসে কদিন ধরে মাথায় খোঁচাতে থাকা প্রশ্নটা করেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত।

ল্যাবের মাঝখানে নতুন একটা রোবট বানানো শুরু করেছেন উপস্থিত প্রফেসর। নাম দিয়েছেন বিধুশেখর। এখন থেকেই টুকটাক কথা বলছে। একে অবশ্য কম্পুর মতো অত বুদ্ধি দেয়া হবে না। তার চোখের গর্তে একটা বাল্ব ফিট করতে করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, 'বেশি বুদ্ধিমানের ওইটেই তো সবচেয়ে দুর্বল ব্যাপার হে ছোকরা। তোমাকে এ মানুষ বলে মনেই করেনি। সবটা নজর শুধু আমার দিকেই দিয়েছিল। তুমি যে ওরকম একখানা সাংঘাতিক কাজ করে ফেলতে পারো, সেটা আন্দাজ করতে পারেনি বেচারা। ফলে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের স্বপ্নটা চৌপট হয়ে বাষ্প হয়ে উবে যেতে হল এই আর কি।'

ছোটোবেলায় যে কাহিনি পড়ে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল, বড় হবার পর যে কাহিনিতে পোস্ট হিউম্যানিজমের ঋদ্ধ স্পেকিউলেশন নতুন করে মুগ্ধ করেছিল, সেই 'কম্পু', তার স্রষ্টা ও তার স্রষ্টার স্রষ্টা এই তিনজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি এই গল্পটি।—লেখক

ছবি স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী

তারিণীখুড়ো আর ডোরাকাটা আতঙ্ক

বৈশাখের এক রবিবারের বিকেল। আকাশে কালো মেঘ জমছে সেজেগুজে। তারিণীখুড়ো বাড়িতে এলেন। আমার ছোটমামা কয়েকটা কমিকসের বই উপহার দিয়েছে কদিন আগে। ন্যাপলা, ভুলু, সুনন্দ আর চটপটি সেগুলো দেখতে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। খুড়োকে ঢুকতে দেখেই তারা একেবারে লাফিয়ে উঠেছে; ন্যাপলা বলল, 'আজ একটা জম্পেশ ভূতের গল্প চাইই খুড়ো।'

খুড়ো আড়চোখে তার দিকে একবার চেয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আগে লক্ষ্মণকে কড়া করে চিনি ছাড়া লাল চা বানাতে বল তো পল্টু। আর কতদিন তোদের বলেছি না, এগুলো সবই আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা! তবে গল্পের চেয়ে কোনও অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়, সেটা ঠিক!

কমিকস-টমিকস মাথায় উঠল। সবাই খুড়োকে ঘিরে গোল হয়ে বসলাম। চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'তোরা তো জানিস পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ভারতের তেত্রিশটা শহরে আমি প্রায় ছাপ্পান্ন রকম কাজ করেছি। সেটা ছয়ের দশকের কথা। তখন আমি এক বীমা কোম্পানির দালালি করি। উত্তরপ্রদেশের রামনগর অঞ্চল আমার কাজের এরিয়া।

একবার উপরমহল থেকে অর্ডার এল, কিছুদূরে কোশী নদীর ধারে গর্জিয়া নামে এক প্রত্যন্ত জনপদে এক ক্লায়েন্টের বাড়িতে যেতে হবে। ইনি অনেক পুরনো ক্লায়েন্ট, মোটামুটি বড় অঙ্কের পলিসি করা আছে তাঁর নামে, কিন্তু বেশ কিছুদিন হল প্রিমিয়ামের টাকা জমা পড়ছে না। আরেকটা নতুন স্কিমের পলিসি করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছিলেন আগে, সেটারও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাঁর

ঠিকানায়; সাড়া মেলেনি। অগত্যা সরাসরি তাঁর বাড়িতে যাওয়া মনস্থ করেছে কোম্পানি।

এই কাজের ভার পড়ল আমাদের দুজনের উপর, আমি আর ডাঃ ব্রজেশ শর্মা। ডাঃ শর্মা আমাদের কোম্পানিরই মাইনে করা ডাক্তার। বয়স্ক বা অসুস্থ ক্লায়েন্টদের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখে তিনি অফিসে রিপোর্ট দেন, তার ভিত্তিতেই ঠিক হয়, ওই ব্যক্তি নতুন বীমা করার উপযুক্ত কিনা। নির্দেশ পাওয়ামাত্র আমরা তড়িঘড়ি রওনা দিলাম গর্জিয়ার দিকে। তোদের বলে রাখি, জায়গাটা কিন্তু করবেট জাতীয় উদ্যানের মধ্যেই পড়ে।'

'মানে সেই বিখ্যাত জিম করবেট?' ভুলু বলে ওঠে।

'হ্যাঁ রে। চারদিকে জন্তু-জানোয়ার ভর্তি বন, দূরে গাড়োয়াল হিমালয়ান রেঞ্জ। দারুণ জায়গা।'

'তার মধ্যে লোকটার বাড়ি?'

'হ্যাঁ,আসলে ভদ্রলোক সাবেক তেহরি গাড়োয়াল রাজবংশীয়। পুরোনো স্থানীয় লোক। একাই থাকেন। কিছুটা নিরিবিলি এলাকা হলেও তাই ওখানেই রয়ে গেছেন, সরকারের অনুমতি নিয়ে।

ভদ্রলোকের নাম মাধবেন্দ্র শাহ। আমরা যখন বাড়ির সন্ধান করতে করতে তাঁর ঠিকানায় পৌঁছলাম, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হব হব। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। অন্তত বিশ বিঘা জমির উপর বাগানঘেরা বাড়ি। তবে বাগানের বেজায় বেহাল দশা। পরিচর্যা হয় না বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে আমাদের দুজনেরই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। বাড়ির বাগানে কেউ স্টাফ করা বাঘের মৃতদেহ রেখে দেয়, আগে কখনও শুনিনি।'

'অ্যাঁ, সে কী খুড়ো! বাগানে বাঘ?'

'হ্যাঁ রে, আর বলতে আপত্তি নেই, স্টাফ করা হলেও সেটা এমনই জ্যান্ত লাগছিল, যে আমাদের দুজনেরই পিলে চমকে উঠেছিল। কোনওমতে নিজেদের সামলে নিয়ে বন্ধ দরজার বেল বাজালাম বারকয়েক। মাধবেন্দ্রজি বলে হাঁকডাকও দিলাম, কোনও সাড়া নেই। ডাঃ শর্মা আর আমি যখন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে ভাবছি, শাহজি আদৌ বেঁচে আছেন তো?

ঠিক তখনই ভারী কাঠের দরজা সরিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল। মাঝবয়সি, চেহারায়, পোশাকে আভিজাত্যের ছাপ দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না ইনিই বাড়ির মালিক। মাথায় আমার চেয়ে কিছুটা লম্বা, কাঁচা পাকা ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখদুটো কটা, স্থির চাউনিতে কী একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার আছে। নমস্কার জানিয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে আমাদের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বললেন, 'আসুন! আপনাদের নোটিশ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার পোষা বেড়ালটার শরীর খারাপ বলে জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ভিতরে আসুন।'

শুনে অবাকও হলাম, আবার বিরক্তিও বাড়ল। বিড়ালের শরীর খারাপ বলে চিঠির উত্তর দেওয়া যায়নি? আশ্চর্য!

বাড়ির ভিতরে গিয়ে শাহজির অনুরোধে একটা বড় সোফায় বসলাম আমি আর ডাঃ শর্মা, তিনি আমাদের বসিয়ে ভিতরদিকে আরেকটা ঘরে গেলেন। বড় হলঘর। মেঝেয় দামি গালিচা পাতা। সেগুনকাঠের ভারী আর পুরোনো সব আসবাব চারপাশে। দেওয়ালে বেশ কিছু অয়েল পেন্টিং। কিছু পোর্ট্রেট দেখে মনে হল তাঁরা শাহজির পূর্বসূরি; আর রয়েছে একটা পুরনো দোনলা বন্দুক।

শিকারের শখও আছে নাকি এ বাড়ির কারোর? বাড়িতে আর কেউ নেই বলেই মনে হল। এত বড় বাড়িতে এমন নির্জন স্থানে একা একজন লোক বসবাস করেন!

তবে শাহজি বেশ অতিথিবৎসল। নিজেই দেখি একটা ট্রেতে করে দু-গ্লাস শরবত বানিয়ে এনেছেন। দারুণ খুশবু ছড়াচ্ছে। আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বের করে গুছিয়ে নিতে শুরু করলাম। সইসাবুদ করাতে হবে।

ডাঃ শর্মা তাঁর ডাক্তারি সরঞ্জাম নিয়ে রেডি হলেন শাহজিকে রুটিন চেক আপ করতে। শাহজি নির্লিপ্ত মুখে তাঁর সামনে বসলেন। ডাঃ শর্মা একবার করে তাঁর রক্তচাপ মাপছেন, বুকে-পিঠে স্টেথো ছোঁয়াচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ভুরুদুটো একটু একটু করে কুঁচকে যাচ্ছে। মাধববাবু অবিশ্যি আগের মতোই নির্বিকার। শেষে আমিই বাধ্য হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কী বুঝছেন ডাঃ শর্মা?'

জবাবে তিনি যা বললেন, শুনে আমি একটা বিষম খেলাম। 'কিছুই বুঝতে পারছি না ব্যানার্জিবাবু ! কোনও জ্যান্ত মানুষের ব্লাডপ্রেশার আর হার্টবিট এত কম!'

মাধববাবুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন মুখে বললেন, 'কী! কী বলতে চাইছেন আপনি?'

আমি সামলানোর জন্য বললাম, 'আহা-হা আপনি উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। ডাক্তারবাবু বলতে চাইছেন, আপনার শরীর খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। তাই...'

'তাই—?'

'তাই আমাদের কোম্পানি আপনার পলিসিটা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারবে না। নতুন পলিসিও করা যাবে না। এই যে, আমাদের রুলবুকে স্পষ্টই লেখা আছে।'

কাগজটার দিকে দৃকপাত না করে হিংস্র গলায় গরগর করে মাধবেন্দ্র বললেন, 'করা যাবে না? বটে? আপনাদের বলেছি তো, ডোরা, মানে আমার পোষা বেড়ালটার শরীর খারাপ ছিল বলে আমার মন মেজাজ ভালো ছিল না। তাই হয়তো শরীরটাও একটু বিগড়োতে পারে। তাই বলে আপনারা এরকম করবেন? এত সাহস? দাঁড়ান!'

ঝড়ের বেগে পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। পরমুহূর্তেই একটা প্রাণীর রক্তজল করা গর্জন, 'ঘ্রা-উ-ম-ম-ম!'

পর্দাটা দুলে উঠল। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল শাহজির আদরের পুষ্যি ডোরা, যাকে কোনওমতেই বিড়াল বলা চলে না। হলুদের উপর কালো ডোরাকাটা ওর দোসরকে খানিক আগেই লনে দেখেছিলাম আমরা। তবে সে ছিল স্টাফড, আর ইনি জ্যান্ত রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

'ও মাই গড।' ডাক্তার শর্মা লাফিয়ে উঠলেন। আমি প্রায় পাথর। বাঘটা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসছে স্থির চোখে। ল্যাজটা অল্প অল্প নাড়ছে এদিক ওদিক। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওদের হাবভাব নাকি এমনই হয়।

'আবার সেই মানুষখেকো বাঘ? ডুমনিগড়েও তো আপনি বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন! আজকেও বাঘের গল্প? ভূত নেই?' ন্যাপলা দুম করে বলে ওঠে।

এই রে! খুড়ো চটে যাবেন না তো? কিন্তু না, আজ তাঁর মুড বেশ ভালো। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'আগে পুরোটা শুনেই দেখ না। কী আছে আর কী নেই নিজেই বুঝতে পারবি।'

বাঘটাকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি যথাসম্ভব মনের জোর এনে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মিঃ শাহ! কী হচ্ছেটা কি? আপনার পোষ্যকে সরিয়ে নিয়ে যান।'

পর্দার আড়াল থেকে ক্রূর হাসির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শাহজির গম্ভীর কণ্ঠ, 'আহা রে! ভয় পেয়ে গেলেন আমার ছোট্ট

বেড়ালটাকে দেখে? সরিয়ে নিতেই পারি। আগে বলুন, আপনারা আমার পলিসি করতে রাজি আছেন।'

ব্রজেশ শর্মা গোঁ-গোঁ করছেন। অজ্ঞান হবার উপক্রম। বাঘটা তাঁর মুখোমুখি। আমিই অগত্যা চেঁচিয়ে বললাম, 'আমরা রাজি। আপনি প্লিজ ওকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

তিনি কী বুঝলেন, জানি না। আবার সেই কণ্ঠ ভেসে এল, 'ইসস! ডক্টর সাব নিজেই পেশেন্ট বনে গেলেন! ডোরা, ওঁকে উপরের ঘরে নিয়ে যাও। মিঃ ব্যানার্জি, আপনিও যান, বিশ্রাম করুন একটু।'

চোখের পলকে বাঘটা অর্ধচেতন ডাক্তার শর্মার জামার কলারের কাছটা কামড়ে ধরে একটা হরিণ শাবকের মতো মুখে তুলে নিয়ে দুই লাফে হলঘরের এক প্রান্তের বাহারি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। আমি স্তম্ভিত! তখন ফের মাধবেন্দ্র বলে উঠলেন, 'ভয় পাবেন না। ও আমার পোষা বিল্লি। যদি আমি না চাই, ও আপনাদের কোনও ক্ষতি করবে না। নিশ্চিন্তে উপরে যান, রাতটা বিশ্রাম করুন। আমি খাবার পাঠিয়ে দেব রাতে। কাল সকালে উনি সুস্থ হলে সইসাবুদ সব মিটিয়ে দেব'খন।'

পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে উঠবে ভাবতেও পারিনি। এই লোকটার বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ডাঃ শর্মাকে নিয়ে তো এই অবস্থায় কিছু করাও যাবে না। বাধ্য হয়েই আমিও সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। একটা টানা বারান্দার একপাশে পরপর দু-তিনটে ঘর। প্রথম ঘরটার দরজা হাট করে খোলা। ভিতরে গিয়ে দেখি পাশাপাশি দুটো খাটের একটায় ডাঃ শর্মা চিত হয়ে শুয়ে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। বাঘটার চিহ্ন নেই কোথাও।

রাতে ঘুম আসার প্রশ্নই নেই। মাধবেন্দ্র রাতের খাবারের জন্য ডাক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু খিদে নেই বলে এড়িয়ে গেছি।

কত রাত তখন খেয়াল নেই, হঠাৎ অস্ফুট আর্ত চিৎকারে সোজা হয়ে বসলাম। ডাঃ শর্মা! তাকিয়ে দেখলাম পাশের খাট ফাঁকা। কী হল?

দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। হলঘরে আসতেই আবার দুটো আওয়াজ। প্রথমটা ডাঃ শর্মার ভয়ার্ত গলা, দ্বিতীয়টা ব্যাঘ্রগর্জন। ডোরা? সদর দরজা খোলা। শাহজি কোথায়?

হঠাৎ চোখ গেল দেওয়ালে ঝোলানো বন্দুকটার দিকে। এক ঝটকায় সেটাকে নামিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছি। আওয়াজটা আসছে বাড়ির পিছন দিক থেকে। কোনও আলো নেই এদিকে। তবে আজ মনে হয় পূর্ণিমা। অপার্থিব জ্যোৎস্নায় জায়গাটা স্বপ্নের মতো লাগছে।

'ডাঃ শর্মা! আপনি কোথায়? সাড়া দিন!'

'আমি এখানে, নদীর ধারে...' গোঙানির মতো স্বর।

নদীর ধার! মানে কোশী নদী। বাড়িটাও কোশী নদীর ধার ঘেঁষেই। পিছন দিকে পুরনো বাউন্ডারি ওয়ালের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে। আগাছা আর ঝোপঝাড়ে চারিদিক বোঝাই। তার ফাঁক দিয়েই দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জলধারা।

দ্রুতপায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম। নুড়ি পাথর বিছানো নদীর পাড়ে দৌড়তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন ডাঃ শর্মা। আর তাঁর দিকে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে ডোরা।

ব্রজেশবাবু নির্ঘাত মাঝরাতে বাড়ি থেকে পালানোর তাল করেছিলেন। পাহারারত চারপেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে ফের কঁকিয়ে উঠলেন ব্রজেশবাবু, 'আমাকে বাঁচান ব্যানার্জিবাবু!'

বাঘটা আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল। ব্রজেশবাবুর আওয়াজে সে ঘুরে আমার দিকে ফিরল। আমি কাঁপা হাতে বন্দুকটা তাক করতেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। বাঘটা হঠাৎ দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, আর তখনই মনে হল তার চেহারাটা আর ঠিক বাঘের মতো লাগছে না।

আমার সন্দেহকে সত্যি প্রমাণ করে প্রাণীটা অবিকল মাধবেন্দ্র শাহের গলায় বলে উঠল, 'আপনার সাহসের তারিফ করতে হয় ব্যানার্জিবাবু। কিন্তু আপনার সঙ্গী ডাক্তারবাবুটি এত ভিতু কেন বলতে পারেন? খামোখা এসব ঝামেলার কোনও দরকার ছিল? দিন, বন্দুকটা আমায় দিয়ে দিন।'

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। চোখের সামনে একটা বাঘকে মানুষ হয়ে যেতে দেখে কারই বা মাথার ঠিক থাকে, তোরা বল! তাই কাঁপা হাতে ধরা বন্দুকটা চালিয়েই দিলাম। কিন্তু বন্দুকের ট্রিগার টিপতে গিয়েই বুঝলাম, একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি। ভিতরে বুলেট নেই! খুট করে শুধু একটা শব্দ হল।

আধো অন্ধকারে মাধবেন্দ্র শাহের কটা চোখদুটো বাঘের মতোই জ্বলছে। সে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল।

আমার সঙ্গে তার ব্যবধান যখন মাত্র হাত দশেক, তখনই আমার মাথার পিছন দিক থেকে আরেকটা হাড় হিম করা গর্জন! এ কী আরেকটা বাঘ! বিরাট এক লাফে সেই বাঘটা আমার মাথার উপর দিয়ে সামনের দিকে প্রায় উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষ মাধবেন্দ্র অথবা চতুষ্পদের উপর। নিমেষে তার টুঁটি কামড়ে ধরে কোশী পেরিয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আমার হাত শিথিল হয়ে এল!

পরদিন সকালে যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ডাঃ শর্মা আমার সামনে বসে। একটু দূরে প্রাসাদের প্রধান ফটক। স্থানীয় কিছু লোক আমাদের ঘিরে আছে। আমায় চোখ মেলতে দেখেই তারা বলে উঠল, 'জয় মা গিরিজা দেবীর জয়!'

কাছেই অনেক পুরোনো একটা মন্দির আছে গিরিজা দেবীর, তাঁর নাম থেকেই নাকি এই জায়গার নাম গর্জিয়া।

'তাহলে লোকটাই বাঘ? মানে ওই ডোরা? কিন্তু পরের বাঘটা? ওটা তো বললেন বাড়ির ভিতর থেকেই বেরিয়েছিল। তাহলে ভূত কোনটা?' চটপটি একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

খুড়ো চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। ফিক করে হেসে বললেন, 'লোকটাই বাঘ, তবে ও ডোরা নয়। সেটা ছিল স্টাফ করা বাঘটা। সেটাই অসুস্থ হয়ে বা বুড়ো হয়ে মরে গেছিল। তারপর থেকে মাধবেন্দ্রর মাথাটা একটু বিগড়ে যায়। স্থানীয় লোকেদের কাছে শোনা গেল, এরপর এক তান্ত্রিকের কাছে নাকি গুপ্তবিদ্যার সাধনা শিখতে শুরু করে মাধবেন্দ্র। সে-ই ওকে মানুষ থেকে বাঘে বদলে যাওয়ার মন্ত্র শেখায়। সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না। তবে আগের রাতে যা হয়েছিল সে তো আমার চোখের সামনেই দেখা।'

'আর ডোরা?' ভুলুর জিজ্ঞাসা।

'সেটা বুঝতে পারলি না? ওহ, ভালো কথা, ফিরে আসার আগে বাগানের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। সেই স্টাফ করা বাঘটাকে কিন্তু আর দেখতে পাইনি।'

সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে তারিণীখুড়ো। পাঁচ কিশোর ন্যাপলা, ভুলু, সদানন্দ, চটপটি আর গল্পকথক পল্টুকে তাদের অনুরোধে একের পর এক চমকপ্রদ গল্প শুনিয়ে গেছেন তিনি। বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক, মহান প্রতিভার অধিকারী শ্রী রায়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্রকে কেন্দ্র করেই একটি নতুন কাহিনি রচনার চেষ্টা করলাম। কিশোর ভারতী

চটপট চিঠি পাঠানো যায় ই-মেলে kishorebharati50@gmail.com

অর্ঘ্য কর্মকার বারাসাত, অশ্বিনীপল্লি, নবীননগর

আমি কিশোর ভারতী তথা পত্রভারতীর নতুন বন্ধু। এই সুন্দর গল্পগুলো দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সব গল্পই আমাকে আনন্দিত করে। থাকে প্রথম মাসিক পত্রিকা পেয়েই খুব সুন্দর লাগল। আমি চাই এরকম মন মুগ্ধ করা গল্প যেন আসতেই ও নতুন রকম কমিকস যেন বেরোতেই থাকে। কিশোর ভারতী পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। পুরো পত্র ভারতীর জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একবার পড়েই এই বই আমার মন কেড়ে নিয়েছে এবং আমি এর বন্ধু হয় গেলাম। আমি পুরো পত্রভারতীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

দেবাশিস বড়ুয়া ৩২ ইন্দ্রলোক, সোদপুর, কলকাতা ৭০০১১০

কিশোর ভারতী এপ্রিল ২০২১ পড়লাম। সম্পাদকীয় স্বমহিমায় উজ্জ্বল। স্বপনবুড়োকে তো আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। ছেলেবেলার 'ছোটদের পাততাড়ি' কেমন করে ভুলি? ছড়া-কবিতা আরো বেশি করে ছাপা যায় না? ৩ টাকা দাম বাড়াটা কোনো বড় কথা নয়। এই অনলাইনের যুগেও ছাপার অক্ষরে পত্র-পত্রিকা পড়ার যে কী সুখ, যে বোঝে সে বোঝে।

প্রিয় বন্ধু, এই মেল ও চিঠিই আমাদের ভরসা। করোনার দ্বিতীয় তাণ্ডবে সব স্তব্ধ হতে চলেছে। তোমরা মতামত দেওয়া থামিও না। দমবন্ধ অন্ধকারে 'তোমাদের কথা'ই আমাদের খোলা বাতাস। ভালো থেকো সব্বাই।

শিউলী জানা প্রামাণিক ও ডা. বিশ্বরঞ্জন প্রামাণিক, কালীপুর, বজবজ

রহস্য গল্পের মোড়কে এপ্রিল ২০২১ সংখ্যা বেশ জমজমাট। 'আমাদের কথা' থেকে কত অজানা তথ্য ভিড় জমাল মনে। গল্পের কথায় বলি, অদ্ভুত কল্পনাশক্তি লেখকের। মনের ভিত নাড়িয়ে দিল নচিকেতার 'পঞ্চাশ ভাগ'। জয়দীপ চক্রবর্তীর 'আশ্চর্য পুতুল' গল্পের রহস্যটি বেশ মজার। সাগরিকা রায়ের 'শব্দ' এলোমেলো করল মনের আনাচ-কানাচ। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর 'সব শেষের পরে' গল্পের মতো হয়তো কোনোদিন রোমিতের ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত হবে, কিন্তু তা আমরা কোনদিনও চাই না। রহস্যময় ঘটনার ঘনঘটা পেলাম অলোক সান্যালের 'রানি ঠাকরুনের সোনার ঘণ্টা'-তে। পুষ্পেন মণ্ডলের 'নীলচে জেলি' একটা প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি করল,যদি কোনোদিন এই কল্পবিজ্ঞান সত্যি হয়, তবে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতেই হবে। বেশ জমকালো রহস্য নীলা নাথ দাসের 'খামেন ভিলার রহস্য'। তবে সেভাবে মন ছুঁল না রঞ্জন দাশগুপ্তের 'পুতুল বুড়ো'। এই সংখ্যার প্রিয় গল্প হিসাবে মন ছুঁয়েছে রম্যাণী গোস্বামীর 'অ্যাস্ট্রাফোবিয়া'! একটা অসাধারণ গল্প।

একটা ছোট্ট আবদার রাখি। 'পাঠকের দরবার'-এ একই প্রশ্ন একাধিক বন্ধু করলে, প্রশ্নের নীচে যেন একাধিক বন্ধুরই নাম থাকে, অনুরোধ রইল। এপ্রিল সংখ্যায় 'পাঠকের দরবার'-এ 'আপনার কি এখনও সেই ছোটবেলার দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, নাকি কর্মব্যস্ত জীবনটাই পছন্দ করেন?'...এই প্রশ্নটি আমিও (শিউলী জানা প্রামাণিক) করেছিলাম, কিন্তু প্রশ্নকর্তার নাম হিসাবে শুধুমাত্র সায়ন তালুকদার-এর নাম আছে। সঙ্গে আমার নামটিও থাকলে অনেক বেশি খুশি হতাম।

যাই হোক, ভালো থেকো কিশোর ভারতী ও তার কলাকুশলীরা। অনেক শুভ কামনা রইল আমাদের তরফ থেকে। আগামী সংখ্যার অপেক্ষায় রইলাম।

রূপক পাল rupakpal997@gmail.com

পত্রারম্ভে আমার সমগ্র 'কিশোর ভারতী' তথা 'পত্রভারতী' পরিবারকে শুভ নববর্ষের প্রণাম, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'কিশোর ভারতী রহস্য-রোমাঞ্চ সংখ্যা ২' নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। 'এমন প্রচ্ছদও করা সম্ভব! !!'—এই বিস্ময়বোধটাকে সমগ্র পাঠককূলে একমাত্র জিইয়ে রেখেছে আমাদের বন্ধু 'কিশোর ভারতী'; তা আমি হলপ করে বলতে পারি। ৯টি গল্প, ধারাবাহিক, এবং নিয়মিত বিভাগ নিয়ে ফের একটি জমজমাট 'রত্ন' আমার বইয়ের তাকে যুক্ত হল। তাই, আজ গল্প বিশ্লেষণে না গিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই—

১. 'জানা থেকে অজানা' বিভাগটি থেকে প্রতিনিয়তই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু না কিছু বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে ও শিখতে পারছি, তাই আমি আবেদন করব, এই বিভাগটিকে নিয়মিত প্রকাশ করা হোক। একই সঙ্গে এটাও বলব 'হরে কর কম' বিভাগটিকে পুনরায় রঙিন করা হোক এবং এই বিভাগেরই উপবিভাগ 'পাঠকের দরবার'-এ সাহিত্যিক, লেখক, প্রকাশক ছাড়াও যারা সাহিত্যপ্রেমী কিন্তু অন্যজগতের গুণীমানুষ (যেমন—খেলোয়াড়, চিত্রতারকা, নাট্যকার) তাদেরকেও হাজির করা হোক। তাহলে আমাদের প্রশ্নে ও তাদের উত্তরে এই আসরটি জমে যাবে বলে আমি মনে করি।।

২. 'সম্পাদকীয়'-তে সম্পাদক মহাশয়ের কাতর আবেদন পড়ে খুবই মর্মাহত হলাম। আমাদের বন্ধু 'কিশোর ভারতী' এত কষ্টের মধ্যেও সেই একই দামে প্রতিনিয়ত আমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে, আর তার কষ্ট আমরা এতদিন টেরই পাইনি!!!! বন্ধুর বিপদে তো বন্ধুই পাশে থাকবে, তাই না? জানি, লকডাউন এবং আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি সকলের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। কিন্তু, বন্ধুর জন্য টিফিনের টাকা জমিয়ে হলেও আমরা সবাই তার পাশে থাকব, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। 'মাসিক ৩ টাকা বৃদ্ধির ফলে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে কখনোই আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে না'। আশা করি, আমার মতো সকল 'কিশোর ভারতী' প্রেমীরাই এই কথাটির সঙ্গে একমত হবেন। কারণ, বন্ধুর কোনো মূল্য হয় না। আর 'কিশোর ভারতী' আমাদের কাছে 'অমূল্য রতন'।

৩. এবং শেষ ও আনন্দের বিষয় হল, ফের আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের জন্মমাসে প্রকাশিত হতে চলেছে 'সত্যজিৎ ১০০' বিশেষ সংখ্যা; যা হাতে পেতে আমরা সবাই মুখিয়ে আছি। কী, তাই না? আজ তাহলে এ পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলের আরোগ্য কামনা করি।

জয়তু 'কিশোর ভারতী'।

কাল বাড়ির খাওয়া শেষ করে শুতে শুতে একটা বেজে গিয়েছিল। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে গাঢ় গভীর ঘুম নেমে এসেছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। কার যেন একটানা ডাকাডাকি, কাঁধ ধরে অবিরাম ঝাঁকুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল।

জেগেছি ঠিকই, কিন্তু ঘুমের ঘোরটা কাটেনি। চোখ মেলতেই মনে হল আবছা মূর্তির মতো কেউ আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা হাত আমার কাঁধে।

'এই যে কুম্ভকর্ণের জেঠামশাই, নিদ্রা বটে একখানা। পুরো দশ মিনিট ধরে ডাকছি আর ঝাঁকাচ্ছি। এতক্ষণে ঘুম ভাঙল!' আরতিমাসির কণ্ঠস্বর। তাঁকে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ছবি রঞ্জন দত্ত

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলাম।

আরতিমাসি আমার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন আর বসে থাকা নয়, চটপট কলঘরে গিয়ে চানটা করে আয়। সকালের খাবার খেয়ে রেডি হয়ে থাক—'

ঘরের জানলাগুলো কাল রাতে বন্ধ করা হয়নি। বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল ভোর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেভাবে আলো ফোটেনি। বেশ অবাক হয়েই জিগ্যেস করলাম, 'এখনও ভালো করে সকাল হয় নি, রোদ ওঠে নি, এত তাড়াতাড়ি চান করে খাবার খেয়ে কেন রেডি হয়ে থাকতে হবে?'

আরতিমাসি তাঁর ডানহাতের আঙুলের ডগা দিয়ে আমার থুতনিটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোর না খুব স্মৃতিশক্তি! কোনও কিছু একবার চোখে পড়লে বা কানে শুনলে কক্ষনো তা ভুলে যাস না। কাল কী কথা হয়েছে, একটা রাত পোহাতে না পোহাতেই ভুলে গেছিস?'

কাল রাত্তিরে কত কথাই তো হয়েছে। কিন্তু আরতিমাসি ঠিক কোনটার কথা বলছেন, বুঝতে পারছি না।

'আরে বাবা, কাল রবিনদাদা কী বলেছিলেন? আজ ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের খেলা আছে। বিকেল চারটেয়। ভোরবেলা রবিনদাদা মানিক আর গণেশকে নিয়ে কালীঘাটে একশো এক টাকার পুজো দিতে গেছে। মোহনবাগানকে যাতে তিন চার গোলে হারানো যায় সেজন্য এই পুজো। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ফিরে আসবে। তাই—'

আর কথা শেষ হতে না হতেই স্মৃতি শক্তি ফিরে এল, 'মনে পড়েছে, সব মনে পড়েছে—!' 'আজ ঘটি আর বাঙালের লড়াই। পদ্মার এপার ভারসাস ওপার।'

ঘরের একধারে একটা দড়ি খাটানো রয়েছে। তোয়ালে ঝুলছে। তড়াক করে খাট থেকে নেমে ছোঁ মেরে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে চানঘরের দিকে দৌড় লাগালাম।

পেছন থেকে আরতিমাসির গলা ভেসে এল, 'রবিনদাদা ম্যাজিক জানে। একদিনেই ছেলেটার মাথায় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, ঘটি-বাঙাল, পদ্মার এপার-ওপার ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

চান করে বাসি ভেজা জামা-প্যান্ট পাল্টে চুল আঁচড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, সিংহনাদের মতো আওয়াজ কানে এল!

'জয় মা কালীঘাটের কালী—'

'জয় মা—'

'তোমার কৃপায় য্যান আইজ ঘটিগো গোলে চাইরবার বল ঢুকাইয়া দিতে পারি।—'

'জয়, ইস্টবেঙ্গলের জয়—'

'জয় জগজ্জননী কালীঘাটের মা কালী!'

'জয়, জয়—!'

স্নিগ্ধ শান্ত, প্রায় নিঝুম সকালটাকে তোলপাড় করে জয়ধ্বনি দিতে দিতে খোলা সদর দরজা দিয়ে তিনজন শোভাযাত্রা করে বাড়ির ভেতর ঢুকল। রবিনকাকু, গণেশদা আর মানিকদা। তিনজনের কপালে পুরু সিঁদুরের তিলক, মাথায় রক্তজবার পাপড়ি। সিঁদুর আর জবা ছাড়াও রবিনকাকুর হাতে শালপাতার মস্ত একটা চাঙাড়ি, সেটার ভেতর কী আছে, জানি না।

হঠাৎ রবিনকাকুর নজর এসে পড়ল আমার ওপর। তিনি থেমে গেলেন। বললেন, 'ছান হইয়া গেছে দেখতে আছি। ফিটফাট হইয়া খাড়াইয়া আছস। ভেরি গুড! আয়। আমাগো লগে ঠাকুরঘরে যাবি।'

আমিও রবিনকাকুদের সঙ্গে পা মেলালাম।

রবিনকাকুরা থাকেন উঠোনের ডান দিকটায়। ওঁদের ঠাকুরঘরটা বেশ বড় মাপের।

ঠাকুরঘরের একধারে কাচ আর কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো কালীঘাটের কালী, কাশী বিশ্বনাথ, দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের বিরাট বিরাট ছবিগুলো খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি ছবি ঘিরে টাটকা ফুলের মালা, চন্দনের ফোঁটা, নীচের দিকে ঝুরো ফুল।

রবিনকাকুদের দেখে সাবিত্রীকাকিমা আর আরতিমাসিও চলে এসেছেন। তাঁদের দিকে শালপাতার মস্ত চাঙাড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে রবিনকাকু বললেন, 'কালীঘাটে পূজা দিয়া আইছি। বাড়ির হগ্গলেরে এই প্রসাদ দাও। হেয়ার পর আমাগো খাওনের বন্দোবস্ত কর। আইজ ইস্টব্যাঙ্গল মোহনবাগানের খেলা। বুঝতেই পারতে আছ আইজ টিকিটের লেইগা কত বড় লম্বা লাইন পড়ব। আমাগো ঘরে যে দেবতারা আছেন তেনাগো আশীর্বাদ চাইয়া লই।'

সাবিত্রীকাকিমা আর আরতিমাসি চলে গেলেন।

রবিনকাকু এবার বললেন, 'ভোরবেলা কালীঘাটে গিয়া মা কালীরে পূজা দিয়া আইছি। আমাগো ঘরেও তিনি তো আছেনই, হেয়া ছাড়াও আছেন আরও কয়জন দেব দেবী। হাতজোড় কইরা লাইন দিয়া খাড়াইয়া পড়। তারপর আমি যা যা কমু, হগলে তাই কইয়া যাবি।'

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মন্ত্রপাঠ করার মতো রবিনকাকু বলতে লাগলেন, 'দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী, বাবা কাশী বিশ্বনাথ, বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ, কালীঘাটের মা কালী, তোমরা আমাগো মনোবাঞ্ছা পূরণ করো। আইজ য্যান মোহনবাগানরে হারাইতে পারি। তোমাগো করুণা, তোমাগো করুণা—'

দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা শেষ হবার পর রবিনকাকু ঠাকুরঘর থেকে আমাদের সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সাবিত্রীকাকিমা আর আরতিমাসি টানা বারন্দায় আসন পেতে রেখে ছিলেন। আমরা বসে পড়তেই প্রথমে কালীঘাটে পুজোর প্রসাদ এল। তারপর খাবার।

শিবনাথমেসো ঘুমকাতুরে মানুষ। অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন। তাই একটু দেরি করেই বিছানা থেকে ওঠেন। বারান্দায় আমাদের খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে, সেইসময় একটা টুথ ব্রাশ হাতে নিয়ে তাঁদের বেডরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকার পর বললেন, 'কী রবিন, কালীঘাটে পুজোটা ভক্তিভরে দিয়েছিলে তো?' আজ যে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা তিনি তা জানেন। শুধু তাই না, রবিনকাকু যে কালীঘাটে পুজো দিতে যাবেনই তা-ও তাঁর অজানা নয়।

রবিনকাকু বললেন, 'ভক্তি ছাড়া পূজা হয় নিকি?'

'ঠিকই তো। তোমাদের ঠাকুরঘরে তো অনেক দেবদেবী আছেন। কালীঘাট থেকে ফিরে সেখানে গিয়েছিলে তো?'

'কী আশ্চর্য, সেহানে যামু না?'

চোখ সরু করে শিবনাথমেসো বললেন, 'এই সব দেবদেবীর সঙ্গে তোমার কতকালের সম্পর্ক। নিশ্চয়ই ভালোরকম যোগাযোগও রয়েছে। আজ কোনওরকম আশাভরসা পাওয়া গেল?'

বুঝতে না পেরে রবিনকাকু জানতে চাইলেন, 'কিসের আশা ভরসা?'

'এই আজ যে খেলাটা হবে তাতে বাঙালরা জিততে পারবে কিনা, সেই ব্যাপারে—'

রবিনকাকু রেগে গেলেন, 'আমি কি করুণাময় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, নাকি বাবা লোকনাথ যে আমার লগে কথাবাত্‌রা হইব! আমি ছোটখাটো

সামান্য একজন মানুষ! ঠাকুরদেবতা লইয়া মজা কইরো না।'

শিবনাথমেসো বললেন, 'না না ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে।' উঠোনে নেমে কলঘরের দিকে চলে গেলেন।

ট্রামরাস্তায় এসে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। মাত্র দুই কি তিন মিনিট। তার পরই একটা চব্বিশ নম্বর ট্রাম এসে গেল। এটা এসপ্ল্যানেড হয়ে ডালহৌসি যাবে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে রবিনকাকু ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠলেন।

তখন জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা অর্ধেক ফাঁকা করে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে। ট্রাম বাসে প্যাসেঞ্জার খুব কম থাকার কথা। কিন্তু শহরটা তো ছোটখাটো নয়। একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগর। যুদ্ধের হিড়িকে কয়েক লাখ মানুষ পালালেও, চার পাঁচ লাখ এখনও থেকে গেছে। তাছাড়া খেলাটা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। শহরের উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমে যেখানে যত বাঙাল আর ঘটি রয়েছে, সব বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের ট্রামটা একটা করে স্টপেজে গিয়ে থামে, সঙ্গে সঙ্গে পনেরো কুড়িজন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে পড়ে। চোখমুখ দেখলেই আন্দাজ করা যায় ওরা কোথায় চলেছে।

কয়েকটা স্টপেজ পেরোবার পর আমাদের ট্রামের ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাস দুটোই বোঝাই হয়ে গেল।

আমাদের সিটগুলো ফার্স্ট ক্লাস কামরার মাঝামাঝি জায়গায়। চারপাশে তুমুল শোরগোল চলছে।

কেউ বলছে, 'লাস্ট ম্যাচে বাঙালদের গোলে তিনখানা ঢুকিয়ে ছিলাম। আজ গুনে গুনে পুরো একগণ্ডা ঢোকাব।'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ তার মোক্ষম জবাব দিল, 'অত নাইচো না সোনা। ভাইবো না, বারে বারে ধান খাইয়া যাইবা। এইবার আমরা তোমাগো গোলে হাফ ডজন ঢুকাইয়া বর্ধমান কি বাঁকুড়ার টিকিট কাইটা দিমু—'

ট্রামের আরেক প্রান্ত থেকে অন্য একজন বলে উঠল, 'কে র‍্যা, আমাদের হাফডজন দিতে চায়? চাঁদবদনকে চিনে রাখ, খেলার পর আদর করব।'

উত্তরটা হল এইরকম, 'তোমরা আর কী আদর করবা? তোমাগো হাফডজন দেওনের পর কোলে বসাইয়া ক্ষীর খাওয়ামু।'

ট্রাম যাত্রাটা এইভাবে সুমধুর হয়ে উঠতে লাগল।

ময়দানের পাশ দিয়ে অনেকটা যাবার পর ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা হঠাৎ হইচই বাধিয়ে দিল, 'কন্ডাক্টর, রোখকে—রোখকে—!'

ট্রাম থামতেই হুড়মুড় করে সব যাত্রী নেমে পড়ল।

রবিনকাকু তাড়া দিলেন, 'জোরে জোরে পা চালা। টিকিটের লাইন এতক্ষণে অনেক লম্বা হইয়া গেছে।'

সেদিন গোপালদা আর মানিকদা আমাকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকটায় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ময়দানের এদিকটায় আগে কখনও আসিনি।

ট্রাম রাস্তা থেকে নেমে যে চকচকে রাস্তাটা দিয়ে চলেছি সেটার সামনের দিকে অনেক মানুষ চোখে পড়ছে। জিগ্যেস করলাম, 'এত লোক কোথায় চলেছে?'

মানিকদা বলল, 'সব ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাচ্ছে। টিকিটের জন্য লাইন লাগাবে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা যেখানে চলে এলাম, তার ডানপাশে আরও কয়েকটা রাস্তা, একটা পার্ক আর বাগানে ঘেরা মস্ত একটা বিল্ডিং দেখতে পেলাম। সেই সব দিক থেকেও পিল পিল করে অনেকে আসছে। বাঁ দিকে একটা বিশাল রাস্তা।

আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল! জানতে চাইলাম, 'এই জায়গাটার কী নাম?'

রবিনকাকু বললেন, 'পরে সব জানতে পারবি। অখন আরও জোরে পা চালা। দেরি হইলে আর টিকিট জুটব না।'

রাস্তায় যেমন অজস্র মানুষ, গাড়ির সংখ্যাও কম নয়। ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে গাড়ির স্রোত থামিয়ে লোকজনকে রাস্তা পেরোবার ইঙ্গিত দিচ্ছে, আবার লোকজন থামিয়ে আটকে-থাকা গাড়িগুলোকে যেতে দিচ্ছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ট্রাফিক পুলিশের হয়তো করুণা হল। তাই অনেকক্ষণ গাড়ি আটকে আমাদের রাস্তা পেরোবার সুযোগ করে দিল। ওপারে গিয়ে ময়দানের ভেতর দিয়ে আর হাঁটাহাঁটি নয়, রবিনকাকুর সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে কাঠের উঁচু দেওয়াল, তার ওপর তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা বিরাট একটা এলাকার কাছে চলে এলাম। দেওয়ালের বাইরে কিছুটা দূরত্ব রেখে চার চারটে লাইনে আমাদের আগে এসে অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। রবিনকাকু আমাদের নিয়ে একটা লাইনের লেজের দিকে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এলাকাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, 'এইটার ভিতরে কী আছে, জানস?'

'না।' আমি মাথা নাড়লাম।
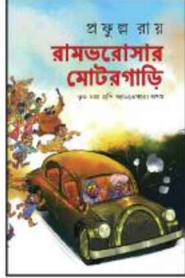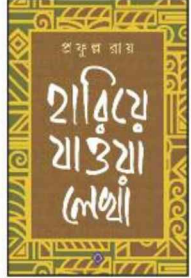
'ইস্টবেঙ্গর আর মোহনবাগান ক্লাবের গ্রাউন্ড। আইজ এইখানেই দুই টিমের খেলা হইব।'

একটু চুপচাপ। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে রবিনকাকু বললেন, 'আইজ প্রথমদিন তরে খেলা দেখাইতে আনলাম। ইস্টবেঙ্গল জিতব তো? তুই পয়া না অপয়া?'

আমার পয়া বা অপয়া হওয়ার ওপর কি ইস্টবেঙ্গলের হার জিত নির্ভর করছে? হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলাম।

(চলবে)

[গত সংখ্যার পর]

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

শেষ চিহ্ন

ছবি রঞ্জন দত্ত

কলিঙ্গরাজ একথা বলার পরই চেদীরাজ চিত্তযানের চোখের সামনে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ এক আলোক প্রভা উত্থিত হতে থাকল সেই পাত্র থেকে। তারপর সেই দন্তধাতু আত্মপ্রকাশ করল। শূন্যে ভাসমান সেই দন্তধাতু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মনমুগ্ধকর শুভ্র আলোক ছটা! পদ্মের সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে কক্ষের বাতাস। জীবনের সব গ্লানি, সব ভাবনা, সব চিন্তা যেন মুছে যেতে লাগল চেদীরাজের মন থেকে! এক নির্মল শান্তিতে, আনন্দে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল চিত্তযানের হৃদয়। এত শান্তি যেন আগে কোনোদিন বোধ হয়নি তাঁর। সেই অলৌকিক শূন্যে ভাসমান পবিত্র ধাতুদন্তর দিকে চেয়ে তার মনে হল জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন করার প্রতীক্ষাতেই যেন ছিলেন তিনি। এ জন্মে তাঁর জীবন সার্থক হল!

নিজের অজান্তেই কখন হাঁটুমুড়ে কলিঙ্গরাজের পাশে উপবেশন করেছেন চেদীরাজ চিত্তযান। মাথা থেকে রাজমুকুট খুলে ভূমিতে নামিয়ে রেখে সব অহং ত্যাগ করে শূন্যে ভাসমান সেই দন্তধাতুর উদ্দেশ্যে তাঁর হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করলেন তিনি। কলিঙ্গরাজ গুহসীব তখন বলতে শুরু করেছেন—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি-ধম্মং শরণং গচ্ছামি-সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

চিত্তযান গলা মেলালেন তাঁর সঙ্গে। দুই নৃপতির কণ্ঠস্বর সেই কক্ষ থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা মন্দিরে। উপস্থিত ভিক্ষুরাও কণ্ঠ মেলাল তাঁদের সঙ্গে।

এক সময় সেই দন্তধাতু ধীরে ধীরে স্বস্থানে অর্থাৎ তার আধারের মধ্যে অন্তর্হিত হল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। শুধু বাতাসে ভাসতে লাগল পদ্মের সুগন্ধ। পাত্রের মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন কলিঙ্গরাজ। উঠে দাঁড়ালেন চিত্তযানও। তিনি কলিঙ্গরাজের হস্ত আবেগমথিত হয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এমন অপার শান্তি আমি ইতিপূর্বে কোনওদিন পাইনি। এ শান্তি থেকে আমি নিজের জীবনকে বঞ্চিত করতে চাই না। অতি দ্রুত আপনি আমার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ব্যবস্থা করুন।'

কলিঙ্গরাজ হেসে বললেন, 'তা নয় করলাম। কিন্তু রাজর্ষি পণ্ডুর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে কী হবে?'

চেদীরাজ চিত্তযান বললেন, 'এ কথা ঠিকই আমার বুদ্ধধম্ম গ্রহণ ও পবিত্র দন্তধাতু ধ্বংস না করার সংবাদ শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হবেন জম্বুদ্বীপ অধিপতি। তিনি দন্তমন্দির ধ্বংস করার জন্য তার নিজস্ব সেনাদল প্রেরণ করবেন। হয়তো বা আমাকে, আপনাকে বধ করার নির্দেশও দেবেন।'

কলিঙ্গপতি বললেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য আমি ভাবিত নই। কিন্তু রাজর্ষির সেনারা এসে যদি কলিঙ্গর সাধারণ নাগরিকদের পীড়ন করে, হত্যা করে তবে তা বড় বেদনাদায়ক হবে।'

রাজা গুহসীবের কথা শোনার পর একটু ভেবে নিয়ে রাজা চিত্তযান বললেন, 'আমার প্রস্তাব, আমার ধর্মগ্রহণ কার্য দ্রুত সম্পন্ন করার পর এই পবিত্র দন্তধাতু নিয়ে আমরা দুজন পাটলিপুত্র অভিমুখে রওনা হব। তাতে রাজর্ষি পণ্ডুর রোষানল থেকে রক্ষা পাবে দন্তনগরী, নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা হবে তাতে। রাজর্ষি পণ্ডু জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হতে পারেন ঠিকই, কিন্তু এই অলৌকিক দন্তধাতুর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান তিনি নন। তিনি রাজর্ষি হতে পারেন, কিন্তু দেবতা নন, আমরা দুজন বুদ্ধের শেষ চিহ্ন নিয়ে পাটলিপুত্র নগরীতে পদার্পণ করার পর ভগবান বুদ্ধের যা ইচ্ছা তাই হবে। আমার ধারণা ভগবানের শেষ চিহ্ন সেখানেও তাঁর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করে রাজর্ষি পণ্ডু সহ সবাইকে মোহিত করবেন।'

কলিঙ্গরাজ বললেন, 'আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আপনার ধর্মগ্রহণ উৎসব সাঙ্গ হলে এই দন্তধাতু নিয়ে আমরা যাত্রা করব রাজর্ষি পণ্ডুর রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীতে।

চেদীরাজ চিত্তযানের দন্তধাতু মন্দির ধ্বংসের পরিবর্তে তার বৌদ্ধধম্ম গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা ছড়িয়ে পড়ল নগরীর সর্বত্র। আর তিনি দন্তধাতুর অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন শুনে চেদীবাহিনীর অনেকেই চেদীরাজের মতোই বৌদ্ধধম্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। দন্তমন্দির আর দন্তনগরীতে চেদীরাজ চিত্তযানের ধম্মগ্রহণ উপলক্ষে দ্বিতীয়বারের জন্য শুরু হল উৎসবের প্রস্তুতি।

নির্গ্রন্টপতি শম্বুকনাতের কাছেও এ সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হল না। নগরীতেই অধিষ্ঠান করছিলেন তিনি। অনেক আশা নিয়ে শম্বুকনাত চেদীরাজকে পথ দেখিয়ে দন্তনগরীতে এনেছিলেন নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। কিন্তু চেদীরাজ দন্তমন্দির, সেই অপবিত্র মৃত অস্থি ধ্বংস তো করলেনই না উপরন্তু নিজে অনুচর সমেত বৌদ্ধধম্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! এ ব্যাপারটা প্রায় উন্মাদ করে তুলল আক্রোশ পরায়ণ নির্গ্রন্টপতিকে।

একদিন যখন নগরীতে তার আবাসস্থানের পাশে নগরবাসীরা চেদীরাজের ধম্মগ্রহণ উৎসব উপলক্ষে অলঙ্কৃত কাষ্ঠতোরণ স্থাপন করছিল তখন সে দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে রাজপথে নেমে অভিসম্পাত দিতে শুরু করলেন কলিঙ্গরাজ আর চেদীরাজের উদ্দেশে! নির্গ্রন্টপতি যে চেদীরাজকে মন্দির ধ্বংস করার জন্য দন্তনগরীতে এনেছিলেন সে সম্পর্কে এতদিনে অবগত হয়ে গেছে নগরবাসী।

দুই নৃপতির উদ্দেশে নির্গ্রন্টপতি শম্বুকনাতকে প্রকাশ্যে অভিসম্পাত ও গালি বর্ষণ করতে দেখে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন নগরবাসী। তারা পাদুকা, কাষ্ঠ খণ্ড নিক্ষেপ করতে করতে পশচাদ্ধাবন করল শম্বুকনাতের। পলায়মান শম্বুকনাত কোনওরকমে প্রাণরক্ষা করে গিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণ কুলপতি স্বয়ম্ভুচার্যর কাছে। তিনি তাঁকে বললেন, 'এখন কি পথ নির্ধারণ করা যায়?'

স্বয়ম্ভুচার্য বললেন, 'বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আমার দিক থেকে আপনাকে প্রকাশ্যে কোনওরূপ সাহায্য করা অসম্ভব। শিষ্য অবলোকেশ্বরও আপনার সঙ্গী হতে অপারগ। কলিঙ্গরাজ গুহসীবের সমর্থনে আজ সবাই সমবেত। এমনকী সাধারণ ব্রাহ্মণরাও কলিঙ্গরাজকে সমর্থন করছেন। আপনি নিজেই তো সব দেখতে পাচ্ছেন, নিজের অবস্থাও বুঝছেন। ওরা আমার ওপরেও বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এমতাবস্থায় আপনাকে আমি কোনও রূপ সাহায্য করছি সে সংবাদ যদি নগরবাসীর কানে যায় তবে আমার ওপরও পাদুকা নিক্ষেপের সম্ভাবনা আছে। আপনার পক্ষে দন্তনগরী আর নিরাপদ নয়। আপনি আবার পাটালিপুত্র নগরীতে গিয়ে রাজর্ষি পণ্ডুকে ঘটনা প্রবাহ বিবৃত করার চেষ্টা করুন। তিনি যদি এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার হয় করবেন।'

ব্রাহ্মণপতি স্বয়ম্ভুচার্যর তাকে সাহায্যদানে অপারগতার কথা শোনার পর আর উপায়ন্তর না দেখে সামান্য কয়েকজন নির্গ্রন্টকে সঙ্গে নিয়ে কলিঙ্গরাজের প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করতে নির্গ্রন্টপতি শম্বুকনাত কলিঙ্গ ত্যাগ করে আবার রওনা হলেন পাটলিপুত্র নগরীর উদ্দেশে।

দেখতে দেখতে চেদীরাজেরও ধম্মগ্রহণের দিন এসে গেল। চিত্তযান ও তাঁর সঙ্গীদের দন্তমন্দিরে ভগবানের শেষ চিহ্নকে সাক্ষী রেখে ত্রিশরণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন প্রধান ভিক্ষু জেতবন। জম্বুদ্বীপের রাজ্যগুলির মধ্যে উজ্জয়িনীর রাজা পূর্ব থেকেই বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন। কলিঙ্গ রাজের পর চেদীরাজও বৌদ্ধধম্ম গ্রহণ করাতে বহুশত বৎসর পর জম্বুদ্বীপের তিনটি রাজ্য উজ্জয়িনী, কলিঙ্গ, চেদীর রাজধর্ম হল বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধর শেষ চিহ্ন বহু শতাব্দীর পর জম্বুদ্বীপে বৌদ্ধধম্মর অঙ্কুর যেন মহাকালের গর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করল। সাত দিবস ধরে আনন্দ উৎসব চলল নগরব্যাপী। এরপর পবিত্র দন্তধাতুটিকে নিয়ে কলিঙ্গ ত্যাগ করে পাটালিপুত্র নগরীতে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করলেন। দন্তমন্দিরে প্রধান ভিক্ষু জেতবন তাঁদের জানালেন, পাটালিপুত্র নগরীতে 'সুভদ্র' নামের পরম বুদ্ধ ভক্ত আছেন। প্রয়োজনে তিনি হয়তো বা কোনও সাহায্য করতে পারেন দুই বৌদ্ধ নৃপতিকে।

যাত্রা শুরুর ঠিক আগের দিন কলিঙ্গরাজ দূত মাধ্যমে জানতে পারলেন উজ্জয়িনীর রাজকুমার বুদ্ধ ভক্ত, ভগবানের শেষ চিহ্ন দর্শনের জন্য উজ্জয়িনী থেকে কলিঙ্গর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু এখন আর কলিঙ্গরাজের পাটালিপুত্র অভিমুখে যাত্রা স্থগিতের উপায় নেই। মহামন্ত্রী ভার্গবকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে উজ্জয়িনী কুমার এলে তাঁর আতিথিয়তার যেন ত্রুটি না হয়। যতদিন খুশি রাজপ্রাসাদে অথবা কলিঙ্গতে তার ইচ্ছামতো স্থানে অবস্থান করতে পারেন উজ্জয়িনীর রাজকুমার।

পরদিন প্রত্যুষে দন্তমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন কলিঙ্গরাজ গুহসীব। দন্তধাতুর পাত্রটি মস্তকে ধারণ করে পথে নামলেন তিনি। ভিক্ষু আর নগরবাসীরা তাঁকে অনুসরণ করে এল কলিঙ্গসীমান্ত পর্যন্ত। অশ্রুসজল চোখে তারা বিদায় জানাল তাঁদের প্রিয় নৃপতি আর ভগবান বুদ্ধর শেষ চিহ্নকে। আটশত বৎসর পর ভগবান বুদ্ধর পবিত্রধাতু কলিঙ্গত্যাগ করে নতুন পথ পরিক্রমায় অবতীর্ণ হল। আর সেই সুদূর পথ পরিক্রমণে কলিঙ্গরাজের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক হলেন চেদীরাজ চিত্তযান।

১১

গুহসীব-কন্যা হেমমালা। ষোড়শী রাজকন্যা হেমমালার গাত্রবর্ণ হেমের মতোই। কেশদাম বর্ষার মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণের। চোখ দুটি দীঘির মতো গভীর। সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। পিতার বড় আদরের কন্যা হেমমালা। পক্ষকাল ধরে বড় বিষণ্ণ

রাজকন্যার মন। পিতা গুহসীব, চেদীরাজ চিত্তযানের সঙ্গে ভগবানের শেষ চিহ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন রাজর্ষি পণ্ডুর রাজধানী পাটালিপুত্র নগরীর দিকে। তিনি কবে আবার দন্তপুরে ফিরে আসবেন, কারো জানা নেই।

দন্তধাতুর অনুপস্থিতি ও গুহসীবের বিরহে কাতর কলিঙ্গনগরী। স্বাভাবিক কারণেই নগরবাসীদের তুলনায় এক পক্ষকাল ধরে পিতার অনুপস্থিতিতে রাজকন্যার বিষণ্ণতা আরও বেশি। প্রসাধনী, অঙ্গরাগের ব্যাপারে তার আর মন বসছে না। সখীদের সঙ্গে কলহাস্যে সে আর মেতে উঠছে না, খেলা করতে যাচ্ছে না প্রাসাদ সংলগ্ন মৃগদারে হরিণ শিশুদের কাছে।

শুধু প্রতিদিন বিকালে সখী শান্তার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য দন্তমন্দিরে গিয়ে সে উপস্থিত হয় সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগ দিতে। মন্দিরে পবিত্র দন্তধাতু না থাকলেও যে মানিক্যখচিত আসনে ভগবানের শেষ চিহ্ন অধিষ্ঠিত ছিল, সেই আসনকেই পূজা করেন ভিক্ষুরা।

প্রতি সন্ধ্যায়, সান্ধ্য পূজা সমাপ্ত হলে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দেন নগরবাসীরা। কোনও কোনও দিন প্রধান ভিক্ষু জেতবন, ভগবানের জীবনী, দর্শন বা জাতক কাহিনী বিবৃত করেন নগরবাসীদের সামনে। রাজপুরুষ থেকে সাধারণ নাগরিক, সবাই ভুমিতলে এক আসনে বসে শ্রবণ করেন ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণী। রাজকন্যা হেমমালাও এ সময় দন্তমন্দিরের প্রার্থনাকক্ষে উপস্থিত থাকে। সমবেত 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ধ্বনিতে সে যোগ দেয়, প্রধান ভিক্ষুর মুখ নিসৃত ভগবানের জীবন কাহিনী শুনে কিছু সময়ের জন্য শান্তি লাভ করে।

এদিনও রাজকন্যা হেমমালা সখী বিন্দুকে নিয়ে সূর্যাস্তের মুহূর্তে গিয়ে উপস্থিত হল দন্তমন্দিরে। না, কোনও স্বর্ণ শিবিকায় চেপে সে উপস্থিত হয় না মন্দিরে। যায় সে পদব্রজেই, অন্য নাগরিকদের মতো প্রথমে সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগ দিল, তারপর মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু জেতবনের মুখ নিসৃত জাতক কাহিনী শ্রবণ করতে বসল সে। এদিন 'ময়ূর জাতক' নামে একটি কাহিনী বিবৃত করছিলেন ভিক্ষু জেতবন। কিন্তু রাজকন্যা কিছুতেই মনোসংযোগ করতে পারছিল না সে কাহিনীতে।

ধর্ম সভা ভঙ্গ হল এক সময়। উপস্থিত নগরবাসীরা প্রার্থনা কক্ষ ত্যাগ করে নিজেদের গৃহ অভিমুখে রওনা হল। প্রার্থনা কক্ষে উপস্থিত ভিক্ষুরাও একে একে নিজেদের কর্ম উপলক্ষে উপাসনা স্থল ত্যাগ করতে লাগলেন। এক সময়ে সেখানে রয়ে গেলেন শুধু জেতবন। প্রার্থনা কক্ষ নিস্তব্ধ হলে বেদীর উপর তিনি ধ্যানস্থ হতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সামনে এসে দাঁড়াল রাজকন্যা হেমমালা।

করজোড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে প্রণাম জানাল শ্রমণকে। বৃদ্ধ শ্রমণ জেতবন হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করে, রাজকন্যার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে বললেন, 'রাজকন্যা বড় বিষণ্ণ বলে মনে হয়। হেতু কী?'

হেমমালা বলল, 'পিতার অনুপস্থিতির কারণে বড় বিচলিত বোধ করছি। আমার এই ষোড়শী জীবনে ইতিপূর্বে আমি একদিনের জন্যও পিতৃছায়া থেকে বঞ্চিত হইনি।'

ভিক্ষু বললেন, 'কলিঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাধ্য হয়েই মহারাজকে নগরী ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে তুমি নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছ। তোমার অলক্ষে তাঁর স্নেহের ছায়া সর্ব সময় ঘিরে আছে তোমাকে।'

রাজকন্যা বলল, 'তা জানি। তবুও মন মানছে না। তাছাড়া অন্য একটা আশঙ্কাও আমার মনের শান্তি বিঘ্নিত করছে। রাজর্ষি পণ্ডু যদি পিতা ও চেদীরাজের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ হেতু তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কোনও ক্ষতি সাধন করেন বা কারারুদ্ধ করেন, তখন কী হবে?'

ভিক্ষু বললেন, 'মহারাজ ভগবানের অনুগত সেবক। ভগবানের শেষ চিহ্ন বহন করে নিয়ে চলেছেন তিনি। তেমন যদি কোনও দুর্বিপাক উপস্থিত হয় তবে ভগবান নিশ্চয়ই তাদের রক্ষা করবেন। তুমি নিশ্চয়ই জানো ওই দন্তধাতু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। চেদীরাজ চিত্তযানও তা দর্শন করেছেন।'

শ্রমণের একথা শুনে রাজকন্যা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেও তার মুখমণ্ডল থেকে আশঙ্কার মেঘ অদৃশ্য হল না। জেতবন তা দেখে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি তুমি শঙ্কা মুক্ত হতে পারছ না। তুমি বহুকাল ধরে রাজপ্রাসাদে একই পরিবেশে অবস্থান করছ। তা যতই বিলাসপূর্ণ হোক না কেন দীর্ঘ দিন একই পরিবেশে থাকলে মানুষের মনে অবসাদ নামে, নানা দুশ্চিন্তার জন্ম হয়। যার থেকে শুধু মন নয়, শরীরেও ক্ষয় আসে। পরিভ্রমণ করলে শুধু দেহ-মন নয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়, ভাবনার চক্ষু উন্মীলিত হয়। সে কারণে আমরা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। আমার পরামর্শ, তুমি প্রাসাদ ত্যাগ করো পথে নামো, তোমার মনের অবসাদ দূর হবে।'

ভিক্ষুর কথা শ্রবণ করে হেমমালা বললেন, 'আপনি কি আমাকে বৌদ্ধ ধম্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হতে বলছেন?'

শ্রবণ বললেন, 'দন্তপুরে তো কোনো ভিক্ষুণী সন্ত নেই। আমি তোমাকে ভিক্ষুণী হতে বলছি না। যেদিন তোমার অন্তরাত্মা নির্দেশ দেবে সেদিন তুমি নিজেই ভিক্ষুণী হবে, আমার বলার অপেক্ষা থাকবে না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, সাময়িকভাবে প্রাসাদ ত্যাগ করে তুমি কোনো অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করো। তাতে তোমার সজীবতা লাভ হবে।'—এ কথা বলে চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন প্রাচীন ভিক্ষু জেতবন।

ধ্যানস্থ বুদ্ধ সেবককে প্রণাম জানিয়ে হেমমালা প্রার্থনা কক্ষ ত্যাগ করলেন। কক্ষের বাইরে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল প্রধান সঙ্গী বিন্দু। তাকে নিয়ে রাজকন্যা যখন পথে নামলেন, তখন নগর তোরণের মাথায় আর রাজপ্রাসাদের প্রাকারে মশালের আলো জ্বলে উঠেছে। সনাতন ধর্মের যে মন্দিরগুলো রাজপথের গায়ে, নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি। মালিকার দল মল্লিকা বিতরণ করছে পথে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই মুক্ত বায়ু সেবন করতে পথে নেমেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজকন্যা হেমমালাকে চিনতে পেরে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছে রাজকন্যাকে।

প্রতিদিনের মতো এদিনও রাজপথে চেনা পরিবেশ। পথ চলতে চলতে রাজকন্যা হেমমালা তার সখী বিন্দুকে বললেন, প্রাসাদের বাইরে এই কলিঙ্গ রাজ্যে তোর এমন কোনও স্থান চেনা আছে যেখানে ভ্রমণ করলে মনের আরাম হবে? ভিক্ষু জেতবন আমাকে মনের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এমনই পরামর্শ দিয়েছেন।'

সখী বিন্দু প্রথমে জবাব দিল, 'নগরীতে বেশ কিছু সুরম্য উদ্যান আছে সে স্থানে তুমি ভ্রমণ করতে পারো।'

রাজকন্যা বললেন, 'নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান তো প্রাসাদকানন। না, উদ্যান ভ্রমণে আমার রুচি নেই। আমি এমন কোনও স্থানে ভ্রমণ করতে চাই, যে স্থান আমার অপরিচিত। যেখানে জন সমাগম নেই, রাজকন্যা পরিচয় যেখানে আমার বিড়ম্বনার কারণ হবে না।'

রাজকুমারীর কথা শুনে সখী পথ চলতে চলতে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কিয়ৎবৎসর পূর্বে তেমন এক স্থানে আমি একবার গেছিলাম।'

হেমমালা বললেন, 'সে স্থান কোথায়? কেমন?

সখী বিন্দু জবাব দিল, 'সে স্থান আমাদের রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থান করছে। অরণ্যের ভিতরে এক বিরাট জলাশয় আছে সেখানে।

অতি নির্জন, মনোরম স্থান। সরোবরের কাক চক্ষু জলে সন্তরণ করে রাজহংসীরা। তার পাড়ে ঘুরে বেড়ায় মৃগ শিশু, পক্ষীকূল নির্ভয়ে উড়ে এসে হাত থেকে শস্যকণা খেয়ে যায়। সে স্থান সত্যিই যেন মর্ত্যের নন্দন কানন! ওই অরণ্য আর হ্রদ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গর সীমানা নির্ধারণ করছে। আপনি যাবেন সেখানে?'

সখীর কাছে সেই সুরম্য স্থানের বিবরণ শুনে রাজকন্যা হেমমালা বললেন, 'তবে কাল প্রত্যুষেই সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব আমরা। সে স্থানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে?'

বিন্দু বলল, 'অশ্ব শকটে যদি যান তবে এক দিবস। আর পালকি বা পদব্রজে গেলে দুই দিবসের কিছু বেশি সময় লাগবে।

রাজকন্যা বললেন, 'আমি পালকিতেই যাব। রাজপ্রাসাদ আর এ নগরীর বাইরে আমি কোনদিন পদার্পণ করিনি। পালকি বা পদব্রজে গেলে ধীরে ধীরে চারদিক দেখতে দেখতে, জ্ঞান আহরণ করতে করতে যাওয়া যাবে, প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

পরিকল্পনা মতোই পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা শুরু করল রাজকন্যা হেমমালা। সঙ্গী বলতে বিন্দু-সহ তার সাতজন সখী, আর সে পালকিতে হেমমালা রওনা হল তার বেহারার দল। দন্তপুর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল তারা। কত রকম ছোট-বড় জনপদ, মানুষজন তাদের যাত্রা পথে! সব অবাক হয়ে দেখতে দেখতে হেমমালা এগিয়ে চললেন তার সখীদের নিয়ে। চারপাশের অদেখা পৃথিবী, নতুন মানুষজন দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে হেমমালার মনের অবসাদ কেটে যেতে লাগল।

তাদের যাত্রা পথে কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। কলিঙ্গরাজ বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করার পর থেকে, দুষ্ট, ক্ষমতালোভী নির্গ্রণ্টপতিকে পরিত্যাগ করার পর থেকে কলিঙ্গর সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা, বৌদ্ধরা, সাধারণ নির্গ্রণ্টরা সবাই এক সঙ্গে বসবাস করছে, নিজেদের মতন করে ধর্মাচার পালন করছে, কোথাও কোনও বিরোধ নেই।

সারা দিন পথ চলে প্রথম দিন তারা আশ্রয় গ্রহণ করল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এক শিব মন্দিরে। মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ আর সেবায়েতের দল যথাযথ ভাবে তাদের আপ্যায়ন ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করল। সেখানে রাত্রিবাসের পর কুক্কুট ধ্বনিতে ভোরের প্রথম আলো ফোটার পরপর বেহারার দল আবার রাজকন্যার পালকি কাঁধে তুলে নিল। এই দ্বিতীয় দিনের যাত্রা পথে কোনও নগরী আর চোখে পড়ল না তাদের। কৃষিজীবি মানুষদের গ্রাম সব। গ্রামের গায়ে রয়েছে ফসলের খেত। কোনও গ্রাম আবার জীবন নির্বাহ করে নদী থেকে মৎস্য আহরণে। প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও চারদিক দেখতে দেখতে চলল রাজকুমারী। দ্বিতীয় দিনের যাত্রা পথ শেষ হতে চলল এক সময়।

বিকাল হলে দূরে দিকচক্রবালে একটা কালো রেখা দেখিয়ে সখী বিন্দু, রাজকুমারীকে বলল, 'ওই হল সেই অরণ্য, যার কেন্দ্র স্থলে সেই মনোরম সরোবর।'

সূর্যদেব যখন বেলা শেষের আলো ছড়িয়ে অস্তাচলে যেতে শুরু করল, সেই শেষ বিকেলে সেই অরণ্যের গায়ে কলিঙ্গরাজ্যের শেষ গ্রামে পৌঁছে গেল রাজকুমারীর শিবিকা। ছোট্ট একটি গ্রাম। কয়েকটি মাত্র পর্ণ কুটীর আছে সেখানে। দরিদ্র মানুষ বাস করে। অরণ্যের গায়েই সেই গ্রাম। এ গ্রামের মানুষরা সামান্য কিছু কৃষি কাজ করে, আর অরণ্য থেকে ফল-মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চল বলে নগর জীবনের সঙ্গে গ্রামবাসীদের কোনও যোগযোগ নেই। আর রাজকুমারীকে যথাযথ আপ্যায়ন করার মতো কোনও ক্ষমতাই এদের নেই। তবুও কলিঙ্গ রাজকন্যা তাদের গ্রামে এসেছেন তা জানতে পেরে কুঁড়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল তারা।

রাজকন্যা হেমমালা তাদের অক্ষমতার কথা বুঝতে পেরে বললেন, 'তোমাদের সংকুচিত হবার, চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই। শুধু রাত্রিবাসের জন্য সামান্য ব্যবস্থা করে দিলেই হবে।'

তবুও গ্রাম প্রধান তার উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলল, 'রাজকুমারী কি পর্ণ কুটিরে রাত্রিবাস করতে পারবেন?'

হেমমালা হেসে বললেন, 'ভগবান বুদ্ধ এমন কত পর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, খোলা আকাশের নীচেও রাত কাটিয়েছেন আর আমি তো সামান্য নারী মাত্র। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

রাজকুমারীর ব্যবহারে আশ্বস্তবোধ করে দুটি পর্ণকুটীরে রাজকুমারীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিল গ্রামের মানুষরা। একটি কুটীরে রইল রাজকুমারী হেমমালা ও সখী বিন্দু, আর অপর কুটীরে আশ্রয় নিল তার অন্য সখীরা। গ্রামের রমণীরা খড়ের শয্যা প্রস্তুত করে দিল রাজকুমারীর জন্য। আহারের জন্য গ্রামবাসীরা রাজকুমারী ও তার সঙ্গিনীদের সামনে উপস্থিত করল কন্দসিদ্ধ ও কিছু ফল। কিন্তু গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার কারণে ঘৃত-পল্লান্নে প্রতিপালিত রাজকন্যা হেমমালার কাছে সেই কন্দমূল সিদ্ধই অমৃত সমান মনে হল। ভোজন সাঙ্গ করে খড়ের শয্যাতে পরম শান্তিতে নিদ্রা গ্রহণ করলেন রাজকন্যা।

পরদিন প্রত্যুষে গ্রামবাসীদের থেকে বিদায় নিয়ে সখীদের সঙ্গে হেমমালা অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তবে বনপথে যেহেতু শিবিকাতে চলা অসুবিধাজনক তাই শিবিকা নিয়ে বাহকের দল অরণ্যের বাইরেই অবস্থান করল। গ্রামবাসীরাও হেমমালাকে আশ্বস্ত করল যে ও বনে কোনও হিংস্র প্রাণী অথবা দস্যুর সম্ভাবনা নেই, কাজেই নিশ্চিন্তেই সেই অরণ্যে প্রবেশ করল হেমমালা। অরণ্যের মধ্যে কত রকম গাছ, কত রকমের পুষ্প! প্রজাপতি, ভ্রমরের দল খেলে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। গাছের মাথা থেকে ভেসে আসছে পাখির সুমধুর কলরব। ঠিক তাদের কল-কাকলির মতোই সখীরা কল হাস্যে মেতে রাজকুমারীকে নিয়ে এগিয়ে চলল বন পথ ধরে। মাথার ওপর বিশাল বৃক্ষরাজি যে চাঁদোয়া রচনা করেছে তার ফাঁক দিয়ে আসা আলো পথ চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

এক প্রহর সময় অতিক্রান্ত হবার পর অরণ্যের প্রায় মধ্যস্থলে তারা উপস্থিত হল। রাজকুমারী জানতে চাইলেন, 'সেই সরোবর আর কত দূরে?'

সখী বিন্দু বলল, 'আর সামান্য পথ বাকি আছে রাজকুমারী।'

কিন্তু এর পরই সামনের পথে সব কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে আসতে লাগল। মিলিয়ে যেতে লাগল পাখির কলতান বা ভ্রমর গুঞ্জন। তার মধ্যে দিয়েই সখী পরিবৃত রাজকুমারী এগিয়ে চলল। কিছু সময়ের মধ্যে সত্যিই গাছের ফাঁক দিয়ে সেই জলাশয় চোখে পড়ল। সখী বিন্দু বলে ওঠে, 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

অরণ্যের বাইরে বেরিয়ে সেই বিশাল হ্রদের কিনারে এসে দাঁড়াল রাজকুমারী হেমমালা। কাকচক্ষু বিশাল জলাশয়ের চতুর্দিকে অরণ্য। কিন্তু অদ্ভুত নিঝুম! সরোবরের পাড়ে অন্য কোনও প্রাণীও চোখে পড়ছে না। রাজকন্যা সখীর কাছে জানতে চাইলেন, 'রাজহংসীর দল কই? হরিণ শিশুরাই কই?'

সখী বিন্দু বলল, 'তারা হয়তো অন্যত্র গেছে। আবার ফিরে আসবে। হ্রদের জল কী সুন্দর দেখেছেন! চলুন, আমরা ওতে অবগাহন করি।'

(চলবে)

পরিচালক আনন্দ বর্ধন

আজব ছড়া

তিলের থেকে তেলটা পাওয়া
তালের থেকে তালমারি
তিলটা যদি তাল হয়ে যায়
বসবে না চিল ওই বাড়ি।
কাটবে খালও দেখে শুনে
জল যেন ভাই কম থাকে
জলের কুমির থাকবে জলে
শয্যে ভরাও মাঠটাকে।
দশ জনেতে চক্র করে
ভগবানকে করলে তাক
ওঝার জন্য ছুটবে কেন
ভগবান তুই সাহস রাখ।
স্বর্গে ঢেকি ধানটা ভানুক
দেখতে চলো আষাঢ় রথ
সঙ্গে রাখো পাক্কা কলা
খেয়েই নেওয়া সহজ পথ।
পরের যাত্র করতে ভঙ্গ
নাকটা কি আজ কেউ কাটে?
অনেক উপায় বলার আছে
সূর্য্য আগে যাক পাটে।

মনিরুল ইসলাম
শালিকা, রাধানগর, পশ্চিম মেদিনীপুর
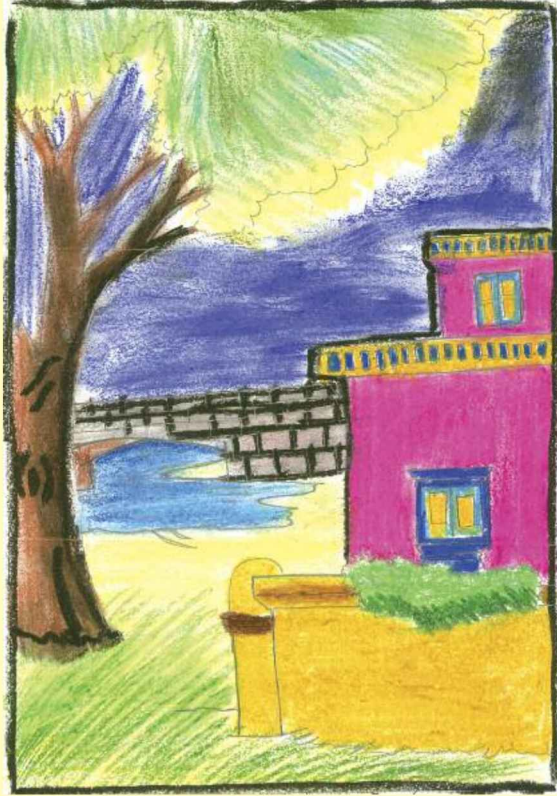
অদ্রিজা আচার্য চতুর্থ শ্রেণি, বিশপ প্রাইমারি গার্লস স্কুল, বাঁকুড়া

ভয় পাই না

মোদের ডরাও চোখ রাঙিয়ে,
মোরা কোনো দিনও ভয় পাই না।
মারের বদলে মার দিতে,
আমরা প্রস্তুত সর্বদা।
তোমরা যদি আঘাত করো
আমরা ছেড়ে দেবো না।
তোমরা যদি চোখ রাঙাও
আমরা ভয় পাই না।
তোমরা যদি ভেবে থাকো
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলবে।
আমরা তবে তোমাদের সঙ্গে
ওই খেলাই খেলব।
তোমরা যদি মদত দিয়ে,
জঙ্গি নিয়ে আসো,
আমরা তবে শূল হাতে,
মৃত্যু ডেকে আনব।
ভয় পাই না আমরা কেউ
ভয় পাই না।
মৃত্যু জীবনের অঙ্গ।
রক্ত হাতে আমরা আবার,
দেব মৃত্যুদণ্ড।
অত্যাচারের খড়্গ নাড়িয়ে,
আমরা জেগে উঠব।
গগন কাঁপিয়ে আমরা
দেব মৃত্যুদণ্ড।

অভিষেক ভট্টাচার্য *ফিঙ্গাপাড়া, ঘোষপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা*

সুজিতকুমার পাত্র

অবিশ্বাস্য

সুভাষদা বাড়ি আছ নাকি? রফিকুল বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে।

স্নান সেরে খেতে বসেছে সুভাষ। পাতে গরম ভাত, মুসুরডাল, আলুপোস্ত, কাতলা মাছের মাথা দিয়ে বাঁধকপির তরকারি, চাটনি। সবে দু-গেরাস মুখে তুলেছে, অমনি রফিকুলের হাঁক।

সামনে বসে মা পাখার বাতাস করছিল। সচকিত হয়ে বলল,—দাঁড়া, আমি দেখছি। তোকে খাওয়া ছেড়ে উঠতে হবে না।

উঠোন পেরিয়ে মা দরজা খুলে দেখেন রফিকুল, সঙ্গে সুদেব। গ্রামেরই ছেলে দুজন।

—কী ব্যাপার রে রফিকুল?

—সুভাষদা কোথায় চাচি?

—ও তো খেতে বসেছে। কেন কী হল? মা শুধাল।

—চাচি, জানো আজ গোয়ালপাড়ার দুধওয়ালা ল্যাংড়া নিতাই সকালে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। এখন ওকে সুজাপুর নিয়ে যেতে হবে পোস্ট মর্টেম করতে। তায় সুভাষদাকে ডাকতে এলাম।

মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—কেন তোরা আর কাউকে পেলি না। ছেলেটা সারাদিন খেটেখুটে এল।

সুভাষ খেতে খেতে সব শুনতে পায়। সে চেঁচিয়ে বলে,—রফিকুল তুই বোস, আমি খেয়েদেয়ে আসছি। রফিকুল আর সুদেব একবার

ছবি স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

আড়চোখে চাচির দিকে তাকায়। তারপর সুড্রুৎ করে চাচির পাশ দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে বারান্দাতে মোড়া টেনে বসে পড়ে।

মা গজ গজ করতে থাকে,—ঘরের খেয়ে যতসব বনের মোষ তাড়ানো! আর পারি না। বললেও কথা শোনে না। কবে যে কোন বিপদ হবে জানি না বাপু।

সুভাষ বাড়ি ঘর তৈরির মিস্ত্রি সাপ্লাইয়ের কাজ করে। বেশ ভালোই ইনকাম। এখন তো বাড়ি তৈরির কাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই সুভাষও বেশ ফুলে ফেঁপে উঠছে। তাদের কাঁচা বাড়ির অনেকটা অংশই পাকা করে ফেলেছে।

বাবা ছিল ভাগ চাষি। খুব অভাবের সংসারে ছিল। হঠাৎই টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে তার বাবা মারা যায়। তখন সুভাষের ঘাড়েই সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে। বয়স তখন তার মাত্র পনেরো। ক্লাস টেনে সবে উঠেছে। আর পড়া হল না। গ্রামেরই এক কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজে লেগে পড়ল। মন দিয়ে কাজ করে এখন সে নিজেই পুরোদমে কন্ট্রাক্টর হয়ে উঠেছে। সংসারটা দাঁড় করিয়েছে। দুই দিদির বিয়েও দিয়েছে।

মহল্লায় সুভাষের পরোপকারী ছেলে হিসেবে বেশ নাম-ডাক আছে। সেখানে যখন যারই কোনো বিপদ আপদ হোক না কেন, রাতবিরেতে সকাল-দুপুর না মেনে সে ছুটে যাবেই। এটা তার চিরকালের অভ্যাস।

রফিকুল আর সুদেব আজ তাই কোনো দ্বিধা না করেই তার কাছে ছুটে এসেছে। জানে এসব কাজে সুভাষদা না করতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে জামা-প্যান্ট পরে সুভাষ বেরিয়ে পড়ে ওদের সঙ্গে। মা জানে ওকে বলে কোনো লাভ হবে না। তাই বেশি জোরাজোরি করেই না। শুধু সতর্ক করে দেয়,—সাবধানে যাস।

শীতের বেলা। প্রায় তিনটে বাজতে চলেছে। এর মধ্যেই রোদ মরে এসেছে। হালকা হিমেল হাওয়াতে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। মাঠ ভর্তি সর্ষে ফুল। গন্ধে ম ম করছে। একটা মন কেমন করা পরিবেশ। মাঠের ভিতর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সুভাষের মনটা উন্মনা হয়ে যায়।

তাদের গ্রাম রোশনপুরের একেবারে শেষ কিনারায় গোয়ালপাড়া। পুরো পাড়াটা ঘোষেদের। প্রতিটা বাড়িতে গোয়াল। আর রাস্তাঘাট সবখানেই গোবরের ছড়াছড়ি। ওই পাড়াতেই বাড়ি নিতাইদার। ছোটবেলায় একটা দুর্ঘটনায় নিতাইয়ের ডান পা-টা কেটে বাদ গেছিল হাঁটুর ওপর থেকে। সেই থেকে ওর নাম ল্যাংড়া নিতাই। কিন্তু দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়—ওই একপা দিয়েই দিব্যি সাইকেলে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে বেড়াত সে। একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো।

যাই হোক, সুদেব জানাল নিজের স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তির জেরেই নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আসলে সুদেবের নিজের মামা, ল্যাংড়া নিতাই। সুইসাইড কেস। তার পোস্ট-মর্টেম করতে হবে। তবে তাকে অতদূরে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। নিজেদের লোকও যেতে চাইছিল না। অগত্যা সুভাষের শরণাপন্ন হয় রফিকুল আর সুদেব।

সব কাজ সেরে একটা বাঁশে ডেডবডিটা বেঁধে ঝুলিয়ে যখন লছিমন ভ্যানে ওঠাল তখন বেলা পাঁচটা। শীতের বেলা। চারদিকে এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠান্ডাটাও বেশ জমিয়ে পড়ছে।

সুজাপুর লছিমন ভ্যানে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। ভ্যানে তারা তিনজন। সুভাষ, রফিকুল আর সুদেব। আর কাউকে পাওয়া যায়নি। ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা।

কিন্তু কপালের ফের বুঝি একেই বলে। কিছুদূর গিয়ে বদীপুর নালা পেরোবার পরই লছিমনের টায়ার গেল পাংচার হয়ে।

চালক বাইজুর মিঞা বলল,—আশেপাশে তো কোনো সারাইয়ের দোকান নেই। টায়ার সারাতে গেলে মাইল দুয়েক দূরে নিয়ামতপুরের মোড়ে যেতে হবে। ওখানে একখানা দোকান আছে। তাও সেটা একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে।

—তাহলে উপায়? সুভাষ চিন্তিত হয়ে বলে।

—উপায় বাবু একটাই, এখান থেকে হেঁটে মাইল দুয়েক গেলে পাকা সড়ক পড়বে। সেই সড়কে অনেক খালি ভ্যান, লছিমন পাওয়া যাবে।

তিনজনের মাথায় বাজ। একেই তো শীতের অন্ধকার। তার ওপর গ্রামে রাস্তা। এই মড়া নিয়ে তিনজন হেঁটে যাওয়া প্রায় দুষ্কর। সুভাষ বলে আর কোনো রাস্তা নাই বাইজুর ভাই?

বাইজুর বলল,—দাঁড়ান দেখছি। জয়নালকে একবার ফোন করে দেখি। ও যদি ফ্রি থাকে তো চলে আসবে।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন লাগায় বাইজুর মিঞা।

—হ্যালো। জয়নাল! কোথায় আছ? অ্যাঁ। করিমগঞ্জে। তাহলে তো ফিরতে অনেক রাত হবে। ঠিক আছে রাখো। আসলে তিনটে প্যাসেঞ্জার ছিল সুজাপুরের। আচ্ছা রাখো তাহলে। আমি দেখছি।

শেষ আশাও নিভে গেল। আর কোনো উপায় নেই। সুভাষ ভাবে আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছে।

তবুও সে খুব একটা ভেঙে পড়ে না। কারণ এসব অভ্যাস তার আছে। অগত্যা হাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তবে শুক্ল পক্ষ বলে কিছুটা হলেও রক্ষে। পথ চলতে সুবিধে হবে। না-হলে তো এধারে ইলেকট্রিকের কোনো সুবিধা নেই। দূরে দূরে কুঁড়েঘরে সব কেরোসিনের আলো জ্বলছে মিটমিট করে।

তিনজন হাঁটতে থাকে। আগে সুভাষ আর পিছনে সুদেব আর রফিকুল। মোরামের রাস্তা। লছিমন চলে রাস্তার বারোটা বেজে গেছে। জায়গায় জায়গায় গর্ত। বৃষ্টি পড়ে আবার সেই গর্তে জলও জমে গেছে। সেই পথেই কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে আস্তে আস্তে চলছিল তিনজন।

আবছা আলো আঁধারি, ঝিঁঝি আর ব্যাঙের দোহার পরিবেশটাকে ভৌতিক করে তুলছিল। মাঝে মাঝে রফিকুল চিৎকার করে গান করছিল। তাতে নাকি গায়ে শক্তি আসে। তার সঙ্গে সুদেবও গলা মেলাচ্ছিল। সুভাষের বেশ মজাও লাগছিল। ওদের যা গলা ভূতেরা হয়তো সেই শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাবে। আর ভাবছিল কতক্ষণে পাকা সড়ক আসবে। কাঁধ ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল। যদিও মাঝে মাঝে ডেডবডিটা নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল ওরা। কিন্তু প্রতিবারই মনে হচ্ছিল ডেডবডিটা যেন আগের থেকে আরও ভারী হচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাবার পর সুভাষ পাকা সড়কের আলোর রেখা দেখতে পেল। ঘড়িতে তখন প্রায় সাতটা বাজে।

পাকা সড়ক যখন পৌঁছল তখন সোয়া সাতটা। ডেডবডিটা রাস্তার পাশে রেখে লছিমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। লছিমনে গেলে হাসপাতাল এখান থেকে প্রায় আরও আধঘণ্টার পথ। পরপর অনেকগুলো লছিমন এল কিন্তু কেউই ডেডবডি নিয়ে যেতে চাইল

না। ডেডবডি শুনেই সবাই নাক সিঁটকে চলে গেল। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছিল।

শেষকালে সাড়ে আটটার সময় একটা টানা ভ্যানকে বেশি পয়সা দিয়ে রাজি করিয়ে ডেডবডি চাপানো হল।

হাসপাতালে পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল।

শীতের রাত। রাস্তাঘাট এরমধ্যেই ফাঁকা। শুধু লরি আর ট্যাক্সিগুলো মাঝেমধ্যে হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হাসপাতালের কেয়ারটেকার বলল,—আজ রাতমে পোস্ট-মর্টেম নহি হোগা। কাল সুবহ আনা হোগা। লাশ মর্গমে রাখ দিজিয়ে। আইয়ে হামারে সাথ।

ওর পিছন পিছন চলল তিনজন। কেয়ারটেকারের হাতে একটা বিরাট লাঠি। হাসপাতালের পিছনে নিয়ে চলল। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের আলোটাতে কিছুটা হলেও রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

একটা জায়গায় এসে থামল কেয়ারটেকার। সামনে বিরাট গোডাউন। পাশে আগাছার জঙ্গল। গোডাউনের পাশে দুটো কালো কুকুর বসেছিল। ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ দূরে দৃষ্টি যেতেই সুভাষ দেখল গোডাউনের পাশের আগাছার ভেতর থেকে কয়েক জোড়া চোখ জ্বল জ্বল করছে। সুভাষ গ্রামের ছেলে। বুঝতে অসুবিধা হল না এগুলো শেয়াল। কেয়ারটেকার লাঠিটা ঘুরিয়ে মাটিতে সশব্দে মারতেই কুকুর দুটো আর শেয়ালগুলো পালিয়ে গেল।

তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে কেয়ারটেকার তালাটা খুলে সাটারটা তুলে দিয়ে বলল,—লাশ অন্দর রাখ দিজিয়ে।

সাটার খুলতেই একটা ভ্যাপসা আঁশটে গন্ধ তীব্র বেগে ছুটে এল। সুভাষের গা-টা গুলিয়ে উঠল। তবু কোনোরকমে নাকমুখ চেপে লাশটা ঘরে ঢোকাল। ঘরটা কী ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সুভাষ সামনে ছিল। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। কয়েক পা এগিয়ে ডেডবডিটা সেখানেই নামিয়ে রাখল। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নীচু হয়ে ডেডবডিটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েই দেখল ওর পা কিছুতেই নাড়াতে পারছে না। জুতো দুটো মনে হচ্ছে কে যেন মাটির সঙ্গে টেনে রেখেছে। চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারছে না। অসহায়ের মতো পিছন ফিরে দেখে ওরা দুজন বডি রেখে বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে চিৎকার করতে গেল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কোনো শব্দই তার গলা থেকে বেরোল না না সেই সময়। একটা হিমেল স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে। এখুনি বুঝি জ্ঞান হারাবে। তবু সে শেষবারের মতো প্রাণপণ চেষ্টা করে জুতোসমেত পা-টাকে টেনে আনতে। ব্যর্থ হয়। হঠাৎ সে বুদ্ধি করে জুতো থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। চুলোয় যাক গে জুতো।

বাইরে এসে হাঁফাতে থাকে। দেখে রফিকুল আর সুদেব হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। কেয়ারটেকার একটু দূরে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে সাটার বন্ধ করবার জন্য এগিয়ে গেল।

সে খালি পায়েই এগিয়ে যায়। ব্যাপারটা সে চেপে যায়। কারোকে খোলসা করে কিছু বলে না। তবে মনে মনে ঘটনাটার কোনো সদুত্তর পায় না।

সেদিন রাতে তারা সুজাপুর হাসপাতালের পাশে ছোট্ট হোটেলটাতে থেকে গেল। রাত্তিরবেলা রফিকুল আর সুদেব রুটি আর চিকেন খেলেও সে শুধুমাত্র মুড়ি-চানাচুর চিবিয়েই শুয়ে পড়ল। মুখে কিছু রুচছিল না। আঁশটে গন্ধটা নাকে লেগেছিল।

অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করে কাটাল। ঘটনাটার কথা চিন্তা করেও মনের মতো ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল ন'টা। তা-ও রফিকুল না ডাকলে ঘুম ভাঙত না। কাল যা ধকল গেছে। মুখ-হাত ধুয়ে তিনজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের সামনের চায়ের দোকানে সর, পাউরুটি আর চা খেল। খুব খিদে পেয়েছিল। রাতে তো প্রায় কিছুই খায়নি সে।

কাল রাতের অন্ধকারে সুজাপুর হাসপাতাল চত্বরটাকে যতটা ভৌতিক মনে হচ্ছিল সকালের আলোতে সেই জায়গাটায় বেশ সুন্দর মনে হল। চারদিকে খোলা জায়গা। মধ্যিখানে হাসপাতাল। গাছ-গাছালিতে ভর্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাব নেই। রাস্তার দুপাশে খাবার দোকান, ফলের দোকান, ওষুধের দোকান সব খুলে গেছে। রাতে সেগুলো বন্ধ ছিল। এখন বেশ জমজমাট মনে হচ্ছে।

চা খেয়ে কেয়ারটেকারের সঙ্গে দেখা করল। কেয়ারটেকার বলল, —চলিয়ে ডেডবডি লেকে ১৩ নাম্বার রুম পে চলা যাইয়ে। আইয়ে হামারে সাথ।

ওরা তিনজন ওর পেছু পেছু গেল। দিনের আলোতে মর্গটা আর ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল না।

সাটার খুলে দিল কেয়ারটেকার। সুভাষ আবার আগে ঢুকল ইচ্ছে করেই। কালকের জুতোগুলোর রহস্যটা জানার জন্যে। ভিতরটা দিনের আলোতে অতটা অন্ধকার লাগছে না। দেখল বিশাল ঘরে সারি সারি লাশ শোয়ানো আছে। আর সেই লাশ থেকে বেরোনো চাপ চাপ রক্তে সারা মেঝেটা পুরো লাল হয়ে আছে। শিউরে ওঠে শরীর।

সুভাষ লক্ষ্য করল তার সেই জুতোটা চাপ চাপ রক্তে আটকে আছে। বুঝল কেন কাল ওটা সেঁটে গেছিল মেঝের সঙ্গে, গামের মতো। কিন্তু আর একপাটি জুতো কই। এধার ওধার খুঁজল কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। তারপর ভাবল টানতে গিয়ে নিশ্চয়ই হয়তো ওটা কোথাও ছিটকে গেছে। আরও একটু ভেতরে ওটা খুঁজতে যেতেই সুদের তাড়া লাগায়,—কী রে হাত লাগা ডেডবডিতে।

সে আর দেরি না করে ডেডবডিতে হাত লাগায়। জুতো ওখানেই পড়ে থাকে। ওই জুতো নেওয়ার প্রবৃত্তি আর নেই।

কেয়ারটেকারের কথা মতো হাসপাতালের একদম শেষপ্রান্তে ১৩ নম্বর ঘরের টেবিলে ডেডবডিটা রেখে দেয় তারা। ঘরটা হাসপাতাল এরিয়ার মধ্যে হলেও একেবারে সেপারেট। মূল বিল্ডিংয়ের অনেকটা দূরে।

একটু পরে ডোম আসে। ওই নাকি কাটা-ছেড়া করবে। তারপর ডাক্তার এসে চেক করে সার্টিফিকেট দেবে।

ডোক এসেই ডেডবডির বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে কাপড়-জামা সব সরিয়ে নিল। নিতাইদার মুখটা এবার দেখা গেল। একহাত জিভ বের করা। চোখ দুটো খোলা। দেখেই ভয় লাগে। গলাতে কালো দাগ। বুঝতে পারল ওটা ফাঁসির দাগ। হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল সুভাষ।

একী! নিতাইদার একমাত্র পায়ে তার সেই হারানো জুতোটা কী করে এল? কিশোর ভারতী

নিজের ঢাক নিজে পেটালে কাহিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ছবি নচিকেতা মাহাত

এ করে কী লাভ হবে? এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুকুজ্যে রুগিমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু! আর একদিকে ছাগল! আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর! আর ভোরবেলা পাখি! পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পারো, আমি তোমার দলে আছি।

তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।
আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!
কিন্তু মেজো, কীভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে? মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে। একটা গোরু, একটা ছাগল তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কীভাবে হবে?
মাথা খাটাতে হবে।
কবে হবে? তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।
সে আমি জানি। কোনও ভালো কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।
তোমার জন্মদিন কবে?
সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।
সেটাই তো ভুলে গেছি রে।

[চলবে]

হরে কর কম

বকবকানি

বন্ধুরা, করোনার প্রকোপ আবার বাড়ছে, তোমরা সবাই খুব সাবধানে থেকো। অনেকে পুরস্কার কিভাবে পাবে জানতে চেয়েছ। বলে দিই আবার, আমরা বছরে দু'বার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান করি। জানুয়ারী আর জুন মাসে। পুরস্কার প্রাপকদের ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ে। গত সংখ্যায় সেরার সেরা হয়েছে আমাদের বন্ধু **অঙ্কিতা রায়**। ওঁকে জানাই অনেক অভিনন্দন।

শব্দজব্দ

পাশাপাশি ঃ
১. অপ্রাপ্তবয়স্ক
৩. সরস্বতী দেবী
৫. অপ্রতিভ
৮. লক্ষ্মী
১০. আলো
১১. আশীর্বাদ
১২. সমারোহ
১৪. কন্দর্প
১৫. কোথায়
১৬. আস্বাদন করা
১৭. নৌকা
১৮. গোপন
২০. স্তুতি
২২. পদ্ম
২৪. বাণ
২৫. ঘোড়ার বলগা

উপরনিচ ঃ
১. চাকর
২. প্রাচীণ যান
৩. আলোকিত
৪. ব্যাধ
৬. দেহ
৭. নশ্বর
৯. পরিব্রাজকের ভিক্ষা
১১. কর্মচ্যুত
১৩ বাঁশের সিঁড়ি
১৪ মঞ্চ
১৭. অন্ধকার
১৮. চর্ম
১৯. নিস্তার
২১. জটিল
২২. নিশানা
২৩. পরামর্শ।

১		২	■	■	৩		৪
	■	৫	৬	৭		■	
৮	৯	■	১০		■	১১	
■	১২	১৩	■	■	১৪		■
■	১৫		■	■	১৬		■
১৭		■	১৮	১৯	■	২০	২১
	■	২২			২৩	■	
২৪			■	■	২৫		

রামপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান ঃ পাশাপাশি ১) কদাচার, ৬) জহর, ৭) ককবরক, ৪) কলম, ১০) রহম, ১২) আপনপর, ১৪) কদম, ১৫) লশকর।
উপরনিচ ২) দানব, ৩) রজক, ৪) করতল, ৫) কাকভোর, ৯) মনোরথ, ১১) হরকরা, ১২) আমল, ১৩) নরক।

সুডোকু

৭		৯		৪	৩			২
		৪				৮		
		৫				৯		
				৬			১	
২	৯						৫	৬
	৪			২				
		৮			২	৭		
		৩				১		
৯			৫	৩		৬		৮

গত সংখ্যার সমাধানঃ

৪	২	৫	৮	৭	৬	১	৩	৯
১	৭	৮	২	৯	৩	৪	৬	৫
৯	৩	৬	৫	১	৪	৭	২	৮
৭	৯	৩	৬	২	১	৮	৫	৪
৬	৫	২	৪	৮	৯	৩	৭	১
৮	৪	১	৩	৫	৭	৬	৯	২
৫	১	৭	৯	৬	৮	২	৪	৩
৩	৮	৯	৭	৪	২	৫	১	৬
২	৬	৪	১	৩	৫	৯	৮	৭

মগজমারি

বাবা ছেলেকে বললেন, দু'বছর আগে আমি তোমার বয়সের থেকে তিনগুন বড় ছিলাম। কিন্তু চোদ্দ বছর পরে আমি তোমার মাত্র দ্বিগুন বড় হয়ে যাব। বলতে পারবে এখন ওদের বয়স কত?

গত সংখ্যার উত্তর ঃ গাড়ির গিয়ারের অবস্থান দেখানো হয়েছে। উত্তর হবে R। সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার পাচ্ছে আমাদের বন্ধু **নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি**।

ছবি-ছড়া

গতবারের সেরা ছড়া ঃ

খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিলেম পাখি,
বুঝবে এবার স্বাধীনতার মানে,
পরাধীনতার কষ্ট কতখানি
যে থেকেছে সেই তো শুধু জানে।

লিখেছে **অরূপরতন আইচ।**

এবারের ছবিটা দেখে তোমরা চমৎকার একটা ছড়া লিখে পাঠিয়ে দাও দেখি চটপট।

টিকটিকি

এক ভদ্রলোক নিজের গাড়িতেই খুন হয়েছেন। তাঁর পিঠে গুলির দাগ। গাড়ির জানলা দরজা সব বন্ধ। ভিতরে কেউ নেই। বাইরে থেকে যে কেউ দরজা খুলে খুন করে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে এমনটাও নয়। অথচ দরজা বা জানলা এমন কোথাও দিয়ে গুলি ঢোকার চিহ্নও নেই। তাহলে ওঁকে খুনটা করা হল কী করে? গুলিটা কোন পথে ঢুকেছে। গোয়েন্দা গড়গড়ি গাড়িটাকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করে এক নিমেষেই বুঝে গিয়েছিলেন। তোমরা কি বলতে পারবে কিভাবে খুনটা করা হয়েছে?

গত সংখ্যার উত্তর হলঃ বিভিন্নজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা গেছে যে সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। তাহলে রুক্মিণী পার্কে বসে খাবার কী করে খায়? অর্থাৎ রুক্মিণীই অপরাধী। পুরস্কার পাচ্ছে হরে কর কম-এর বন্ধু **অগ্নিভ চক্রবর্তী**।
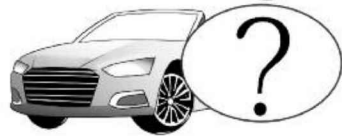
ঠিকানাঃ হরে কর কম কিশোর ভারতী ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৯। ই-মেলঃ harekorokom@gmail.com

পাঠকের দরবার

বন্ধুরা, তোমাদের প্রিয় কিছু মানুষদের আমরা হাজির করব এই আসরে। অনেক না জানা প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাঁরা। আজকের আসরে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি আমাদের প্রিয় লেখক **শ্রী স্বপন বন্দোপাধ্যায়**-এর সঙ্গেঃ

প্র. আপনার লেখায় রহস্য-রোমাঞ্চ বেশ জমজমাট থাকে। কিন্তু আপনাকে খুব বেশি পত্র পত্রিকায় পাওয়া যায় না কেন? *দেবাশিস বড়ুয়া, সোদপুর।*

উ. আসলে লেখার ব্যাপারে আমি বরাবরই বেশ খুঁতখুঁতে। একটা লেখা দুবার রিভিসান না করে জমা দিই না। কাজেই লেখার পরিমাণ কম।

প্র. গত প্রায় ২০ বছরে আপনার থেকে সেইরকম সংখ্যক কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী পাইনি। এর কোনও বিশেষ কারণ আছে কি? *অমিতাভ চক্রবর্তী, ব্যান্ডেল।*

উ. এক সময়ে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে মজে ছিলাম। তখন আমার মূল প্রেরণা ছিলেন ফ্যানটাসটিক পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত অদ্রীশ বর্ধন এবং কিশোর ভারতীর সম্পাদক প্রয়াত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে সময়ে কল্পবিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশকে নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস গল্প লিখেছিলাম। ওঁরা চলে যাবার পর মনের গতি পালটালো। তবে আজও আমার লেখা কল্পবিজ্ঞান থেকে গেছে রহস্যভেদী মেঘনাদের কোন কোন কাহিনিতে।

প্র. আপনার কাছেই একবার শুনেছিলাম যে আপনি প্রথম জীবনে ছড়া-কবিতাও লিখেছেন। এখন আর ছড়া-কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না? *অমিতাভ চক্রবর্তী, ব্যান্ডেল।*

উ. সারা জীবনে আমার মনের গতির সঙ্গে লেখার ধারাও বারবার পাল্টেছে। প্রথম জীবনে লিটলম্যান এবং প্রয়াত কুমারেশ ঘোষের 'যষ্ঠীমধু' পত্রিকায় প্রচুর ছড়া লিমেরিক লিখেছি। এখনও আমার ছড়া কখনও কখনও ভেসে ওঠে রহস্যভেদী মেঘনাদের কোন কোন কাহিনির ধাঁধা হেঁয়ালির মধ্যে।

প্র. আপনি গত প্রায় ৫০ বছর ধরে লিখছেন। এখনও আপনার লেখার জন্য অগণিত পাঠক-পাঠিকা অপেক্ষা করে থাকেন। আপনার মতে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি কি? *অমিতাভ চক্রবর্তী, ব্যান্ডেল।*

উ. আমি জনপ্রিয়তার কথা ভেবে কোনদিন লিখিনি। লেখা আমার জীবনের এক ওতপ্রোতসত্তা। সে লেখা পাঠকের ভালো লাগলে পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞ হই। যেদিন আর ভালো লাগবে না, আমার কলম স্তব্ধ হয়ে যাবে।

প্র. আপনার লেখালেখির সূত্রপাতের দিনগুলির গল্প শুনতে চাই। *সায়ন তালুকদার, বরাহনগর।*

উ. সে তো অনেক কথা। এখানে বলার সুযোগ নেই। এটুকু বলতে পারি প্রায় জ্ঞান হবার পর থেকেই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বোধ করেছি। বিশেষ করে শৈশবে ঠাকুমা ও মায়ের চিন্তা চেতনা থেকে। পড়তে তো শুরু করলাম তারপর।

প্র. মেঘনাদ, অর্ণব বা ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্র চরিত্রত্রয় কি পুরোপুরি আপনার কল্পনাপ্রসূত নাকি কোনো বাস্তব বা কোনো দেশী-বিদেশি গোয়েন্দা চরিত্রের ছায়া আছে? *প্রতাপ পাল, কোচবিহার, রূপক পাল, কোন্নগর, সায়ন তালুকদার, বরাহনগর।*

উ. আমরা কোন লেখকই নিজেদের স্বয়ম্ভু দাবী করতে পারি না। কোন কোন চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা তো থাকেই, হয়তো লেখকেরও অজ্ঞাতসারেও। বাকিটা পাঠক বিচার করবেন।

প্র. বাস্তব জীবনে 'রহস্যভেদী মেঘনাদ'-কে দিয়ে কোন রহস্যটা সমাধান করলে ভালো হত বলে আপনি মনে করেন? *রূপক পাল, কোন্নগর।*

উ. সারা জীবনে প্রিয় পাঠকের সম্মান যত পেয়েছি, নানা সময়ে কন্টকবিদ্ধ, রক্তাক্তও কম হইনি। সবই মেনে নিয়েছি নীরবে। এখন ভাবি মেঘনাদকে দিয়ে এসবের একটা তদন্ত করলে কেমন হয়? জানতে পারি আমার ত্রুটি কোথায়!

প্র. লেখালেখির ক্ষেত্রে আপনার কি কোনও মোটিভেটর আছে, নাকি, আপনি নিজেই নিজের মোটিভেটর? *অরূপরতন আইচ, কোন্নগর।*

উ. প্রায় যাট বছর সাহিত্যজীবনে যার কাছে যা কিছু শিখেছি সবই সঞ্চয় করে নিয়েছি। এরা সবাই আমার 'মোটিভেটর'। এদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

প্র. আপনি কি অপ্রাকৃত/অবিশ্বাস্য ঘটনায় বিশ্বাস করেন? জীবনে কি কখনও এরকম কোনো ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছিল? *রূপক পাল, কোন্নগর।*

উ. আমি আধ্যাত্মিকতা মানি কিন্তু অপ্রাকৃত বিশ্বাস করি না। তবে গল্পের উপাদান হতে পারে।

প্র. আপনার কি মনে হয় ছোটদের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা আরও বাড়া দরকার? *শান্তনু সমাদ্দার, ডানকুনি।*

উ. নিশ্চয়ই। তবে ছোটদের পত্রপত্রিকার লেখা ছোটদের উপযোগী হওয়া উচিত।

প্র. বর্তমান সময়ে কোন অল্পবয়সি ছেলে বা মেয়ের কি লেখালিখিটাকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া উচিত, নাকি, চাকরি করতে করতে অবসর সময়ে শখের লেখালেখি চালানোটাই সঠিক বলে আপনার মনে হয়? *অরূপরতন আইচ, কোন্নগর।*

উ. সাহিত্যকর্ম একটা দীর্ঘ সাধনা। প্রস্তুতি এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে 'হোলটাইম' লেখক হওয়া যেতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এসময়ে লিখে বা বই প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সম্মান-দক্ষিণা পাওয়া যায় না।

প্র. সার্থক গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে হলে কোন কোন বিষয়গুলো লেখককে সবচেয়ে আগে মাথায় রাখতে হয় বলে আপনার মনে হয়? *অর্ণব ভট্টাচার্য্য, ভদ্রকালী, হুগলি।*

উ. সার্থক গোয়েন্দা কাহিনি হল লেখক-পাঠকের মধ্যে বুদ্ধির খেলা। পাঠক আগেই অপরাধী চিনতে পারলে লেখকের হার, না হলে জিৎ। এই সঙ্গে লেখাটা আকর্ষণীয় তো হতেই হবে।

প্র. বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত কেমন বলে আপনার মনে হয়? *অর্ণব ভট্টাচার্য্য, ভদ্রকালী, হুগলি।*

উ. আমার মতে এটা নির্ভর করছে বাংলার আগামীদিনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের ওপর। এর কোনটাকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা যায় না।

প্র. অনেকে বলেন এখন বাংলায় লেখক বেশি, পাঠক কম। আপনি এই উক্তিকে সমর্থন করেন? *অর্ণব ভট্টাচার্য্য, ভদ্রকালী, হুগলি।*

উ. আমি এভাবে ভাবি না। সাহিত্য কর্মের প্রতি আগ্রহ থাকা তো ভালো। তারপর ১৫ বছরের পরও সে আগ্রহ বজায় থাকলে এবং পাঠকের স্বীকৃতি পেলে তবেই সার্থক লেখক। যেমন গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে ওঠা।

আগামী সংখ্যায় থাকবেন প্রতিশ্রুতিমান সুরকার, গায়ক ও লিরিসিস্ট **শ্রী রণজয় ভট্টাচার্য্য**। তোমার মনে ওঁর জন্য জমে থাকা প্রশ্নটা হরে কর কমের ঠিকানায় ইমেল করে পাঠাতে পারো। তোমার হয়ে আমার উত্তরটা জেনে নিয়ে এই বিভাগে লিখে দেব।

কেমন করে আমি হলাম

এই নতুন বিভাগটিতে আমাদের প্রিয় মানুষরা জানাবেন কেমন করে তিনি সফল হলেন তাঁর এই পেশায়। তোমরাও উদ্বুদ্ধ হবে ওঁর জীবনের এই অপঠিত কাহিনি শুনে। আজ সাহিত্যিক **শ্রী হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত** শুনিয়েছেন তাঁর কথাঃ

প্র. *কেন লেখালিখিকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন?*

উ. পেশার সঙ্গে মনের যদি মিল থাকে তবেই সেটা মানুষকে আনন্দ দেয়। আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালিখিকে বেছে নিয়েছিলাম পেশা হিসেবে।

প্র. *কীভাবে সফলতা পেলেন? কোনো বিশেষ পদ্ধতি?*

উ. যে-কোনও পেশায় সফল হতে গেলে দরকার হয় পরিশ্রম, একাগ্রতা, ভালোবাসা আর থাকে 'এক্স ফ্যাক্টর'।

প্র. *আপনার এই সফলতার পিছনে কারো বিশেষ কোনো ভুমিকা আছে কি?*

উ. আমি জানি না আমি সফল কিনা, তবে সমাজের প্রতিটি কোণই আমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্র. *যারা এই পেশায় আসতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কি?*

উ. লেখালিখিকে সম্পূর্ণ সময়ের পেশা হিসেবে বেছে নিতে চাইছে যারা তাদের বলব, এই পেশায় বিশাল একটা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' আছে। যতদিন না সে সফলতা পাচ্ছে ততদিন মানুষ তাকে মেনে নেবে না বা মূল্য দেবে না। চাকরি, খেলাধুলো, সঙ্গীত, অভিনয় বা অন্য পেশায় সফলতা যেমন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আসে, এই পেশায় কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই এই অনিশ্চয়তার কথাটা মাথায় রাখাটা দরকার।

মনে রেখো বন্ধুরা! হরে কর কম-এর সমস্ত প্রতিযোগিতার উত্তর আমাদের কাছে ১৫ মে-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে কিন্তু!

হেসেই খুন

বল্টু জামগাছের পাশে একটি গোলাপ গাছের চারা লাগাচ্ছিল, তাই দেখে এক পথিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, জামগাছের পাশে গোলাপ ফুলের চারা লাগাচ্ছ, কী ব্যাপার?'
বল্টু 'খোকা' ডাক শুনে রীতিমতো রেগে গেল। দাঁতে দাঁত চিপে সে জবাব দিল, 'গোলাপজাম খাব তো, তাই জামগাছের পাশে গোলাপের চারা লাগাচ্ছি!'

***

আকাশের সূর্য নিয়ে দুই পাগলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে। এক পাগল বলল, 'ওটা আগুনের গোলা!' আরেক পাগল বলল, 'না, ওটা চাঁদ!' তাদের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়ে ঠেকল।

ঠিক তখনই ওখান দিয়ে একজন পথচারীকে যেতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, 'বলুন তো, ওটা আগুনের গোলা, না আকাশের চাঁদ?' পথচারী মাথা চুলকে বলল, 'ইয়ে, আমি এ পাড়ায় থাকি না, তাই ঠিক বলতে পারছি না!'

মিল, অমিল, বেমিল

ব্যস্ত শিল্পী নচিকেতা তাড়াহুড়ো করে আঁকতে গিয়ে একই ছবি দু'বার এঁকে ফেলেছে। কিন্তু ভালো করে দেখলে দুটো ছবিতে বেশ কিছু অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে। দেখো তো তোমরা খুঁজে পাও কিনা।
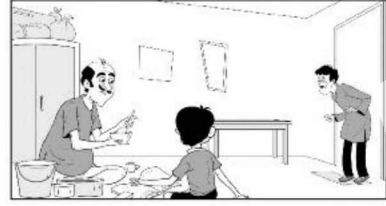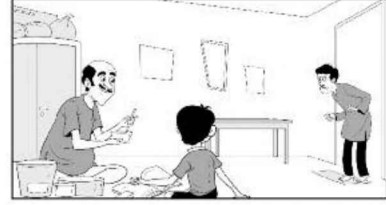
ছবির মজা, মজার ছবি

নিচের নম্বরগুলিকে পেন্সিল দিয়ে জুড়ে দ্যাখো তো কী পাওয়া যায়।
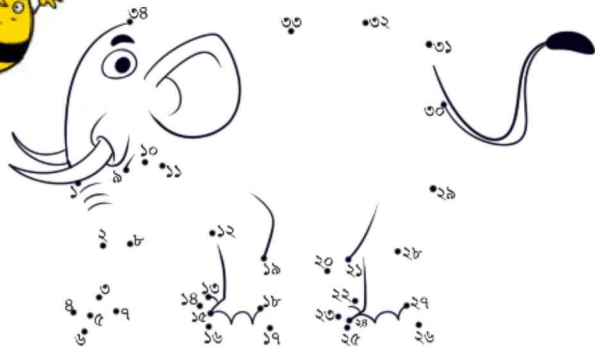
ধাঁধা-ধন্দ

১
কোন ফলের ফুল
ফোটে কি ফোটে না,
সকালে-বিকালে
কেউ তো দেখে না।

২
মধ্যখানে একটু জল
চুনকাম করা ঘর।
ভেঙে গড়তে বললে
গায়ে আসে জ্বর।

৩
একলা তারে যায় না দেখা
সঙ্গী পেলে বাঁচে।
আঁধার দেখলে ভয়ে পালায়
আলোয় ফিরে আসে।

গতবারের উত্তর ঃ
১) আমড়া, ২) সিলিং ফ্যান, ৩) বাঁশপাতা।

চিনতে পারো?

নিচের প্রচ্ছদটা কোন বইয়ের বলতে পারবে?

মুখের মতো...

প্রশ্নঃ ফোর্ড যদি গাড়ির নাম হয়, তবে অক্সফোর্ড কিসের নাম?

উত্তরঃ গরুর গাড়ি, আবার কী!

দাঁতকপাটি

'আজ আমার ছয় বছর পূর্ন হল। অথচ কেকটা একবছরের চাইতেও পুঁচকে। আমার মত গোলগাল বিল্লীর জন্য এই কেক!! এদিকে সারাদিন তো আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে বেড়ায়। কিপটেমির লিমিট থাকে একটা।'

'ভাগ্যিস আমাকে ব্যাকসিটে একা বসতে দিয়েছে। কী সুন্দর সব দেখতে পাচ্ছি আরাম করে বসে। গতবার সামনের সিটে বসে যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল। সবাই আবার হাঁ করে আমাকে দেকচে গ।'

জিনিয়া দত্ত

মোটিভেশন

"সৎ মানুষ বিপদে পড়লেও ঘুরে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একেবারে নিপাতে যায়।"

স্বামী বিবেকানন্দ

অলঙ্করণ **নচিকেতা মাহাত** পরিচালনা **কৌশিক শ**

অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

সাত রাজার ধন এক মানিক

একটা মানুষ, ঠিক বলছ কি? এত অসাধ্য কাজ,
একাই করত? কী জানি! ভেবেও পাচ্ছি না আন্দাজ।

রঙ তুলি আর ক্যানভাস পেলে সে আঁকত অনায়াসে
জীবন চিত্র, প্রকৃতির মায়া, শিশির বিন্দু ঘাসে।

একই সেই লোক ছবিও বানাত! আলোছায়া জলছাপে...
সেলুলয়েডের জীবন কাব্য...কাহিনি ও সংলাপে।

সেই নাকি ফের লিখত কাহিনি? মনের ভেতরে ঢুকে
গেঁথে দিয়ে যেত তারিণী খুড়ো ও প্রফেসর শঙ্কুকে।

কাহিনি কী আর এক রকমের? পাতা পার হয়ে পাতায়,
তোপসে জটায়ু ফেলুদা ঘুরেছে, বিদেশে ও কলকাতায়।

কী অবলীলায় লিখে ফেলত সে, সমস্ত অভাবিত।
হরেক ছড়ানো মানুষ মনের গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতও।

শুধুই কি মেধা? ভালোবাসা আর মানবতা দিয়ে ঘেরা
নরম স্বপ্ন দিয়ে বোনা তার কাজের মুহূর্তেরা।

আসলে জাদুর ছোঁয়া ছিল তার তুলি পেন ক্যামেরায়!
সাতটি রাজার ধন এক মানিক...সে সত্যজিৎ রায়।

কমলেশ কুমার

বৈশাখী

অখণ্ড এক আকাশ যখন বোশেখদুপুর
রোদফুল আর হঠাৎ করেই বৃষ্টিফোঁটা
ছেঁড়া শহর ভাসতে থাকে উপুড়-ঝুপুড়
সিঁড়ির নীচে আলোর মতো চমকে ওঠা!

স্বপ্নধোয়া খুশির মালা রঙিন ধুলো
তৃষ্ণা সজল নৈঋতে মেঘ কী আলাপন
বাক্স থেকে বের করেছি ইচ্ছেগুলো
রামধনু রং জানল কেমন মনের গোপন!

ভোরের আজান চিনল ঠিকই ছোট্টবেলা
মাটির ভিতর স্নিগ্ধ ঘাসের খুশির ছবি
দূর্বাদলে হাওয়ার কাঁপন ইচ্ছেখেলা
মেঘলাপাড়ায় সম্মোহনের কী ভৈরবী!

বুকপকেটে দুঃখগুলো জমিয়ে রাখি
নীল অভিমান লাট্টু-লাটাই-জামার বোতাম
হারিয়ে গেছে রাজার মুকুট একলা পাখি
অতীত কেমন শূন্যে হারায় নেই কোনো দাম!

ছবি রঞ্জন দত্ত

দীপ মুখোপাধ্যায়

একাই একশো

একশো একাই সত্যজিৎ
গুপীর গলায় খুশির গীত
মনের ভেতর সারাক্ষণ
তপসে ফেলু লালমোহন।

উঠল বেজে বাঘার ঢোল
শঙ্কু থামায় গন্ডগোল
ইচ্ছেগুলো চাইছে তাই
কল্পলোকের গল্প চাই।

রেখায় লেখায় সূক্ষ্ম কাজ
হাল্লা থেকে হীরকরাজ
পড়তে পড়তে অতঃপর
ভূতের রাজা দিলেন বর।

মুকুল, সোনার কেল্লা, যায়—
ভাবিয়ে তোলে সব আমায়
মগজ-অস্ত্রে ফেলুর জয়
দুষ্টুদেরও হারতে হয়।

তারিণীখুড়োর গল্প কই
খান পনেরো ভূতের বই?
সময় ভুলি ভাত খাবার
পড়তে পড়তে রাতকাবার।

একটি মানিক জ্বলছে তাই
বইগুলোতে হাত বাড়াই
ছন্দ ছড়ায় হাজার স্কিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

বঙ্কু ডাক্তার আর অনন্ত রায়ের বাক্স

ডাঃ সায়ন পাল

গত সংখ্যার পর

অন্নদামঙ্গল ভুলে গেছ? 'দ্বন্দ্ব' মানে শুধু ঝগড়া নয়, 'মিলন'ও বোঝায়।
?
'আশু'র সাথে 'তোষ'এর মিলন, অর্থাৎ 'আশুতোষ', মানে – 'শিবঠাকুর'। বুঝলে?
শিবঠাকুরের হার ?? তার মানে?
বলাই বাহুল্য, 'হার' মানে পরাজয় নয়, এই হার হল কন্ঠহার। তার মানে –
মানে রুদ্রাক্ষের মালা? নাকি আকন্দের মালা?
উঁহু, "কর্পূরগৌরম, করুণাবতারম্ সংসারসারম্ – ভুজগেন্দ্রহারম্॥"
অর্থাৎ শিবঠাকুরের গলার সাপটি?
ঠিক। ভীম, দেখো তো, সাপটার মাথা ঘোরানো যায় কি না?
শক্ত, তবে ঘোরানো যাচ্ছে!
দেখিস, ভেঙে টেঙে দিস না বাপ!
একবার .... দুই ... তিন .... চার ....
পাঁচবার ঘোরাতে হবে কিন্তু।
জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করবি? নাকি তোর মুন্ডুটাও পাঁচবারে ঘোরাব?
খুট!
!
কই? কিছু তো হল না?
হবে বাপু, রোসো! পরের লাইনটা মনে করো। "জীবন যদি অর্থহীন, আসবে জেনো ঠিক সুদিন, কাঠমান্ডুর টানে যখন বিষ্ণুপ্রিয়া খুলবেন দ্বার॥"
'বিষ্ণুপ্রিয়া' অর্থাৎ মা লক্ষ্মী, অর্থহীন জীবনে অর্থের আগমন ঘটান। এক্ষেত্রে কাঠমান্ডু, অর্থাৎ –
মা কালীর হাতের কাটামুন্ডুটি ধরে টান দিতে বলা হয়েছে।
তাহলে এক টান মেরে দেখাই যাক, কত কান্ড কাঠমান্ডুতে?
জয় মা কালী! — অ্যাই মরেছে! পুরো হাতটাই নেমে এল যে!
ঘটাং
ঘড় ঘড় ঘড়!
?
বাঁচাও!

[চলবে]

কাহিনি
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুখোশের আড়ালে
চিত্রনাট্য ও ছবি
প্রদীপ্ত মুখার্জি
মামা ক'টা বাজে?
৯টা। তার আসার সময় হয়ে গেছে। আর কথা---
শ-শ-শ-শ!
নিথর অরণ্যের বুকে সহসা বেজে উঠেছে কারও গোপন পদচারণার শব্দ।
খস্-খস্-খস্
পাশাপাশি দুটো পা ফেলার শব্দ। আগন্তুক একজন নয়---দু-জন!
বীরু, আমি ঢুকছি। মালগুলো নিয়েই বেরিয়ে আসছি।
ঠিক আছে, সাব।
অ্যালার্ট থাকিস। কারুর কোনও সাড়া পেলেই কুইক শিস দিবি আর তির চালাবি।

ও-উ-ফ!
থ্যাকারে!
হ্যান্ডস্ আপ!
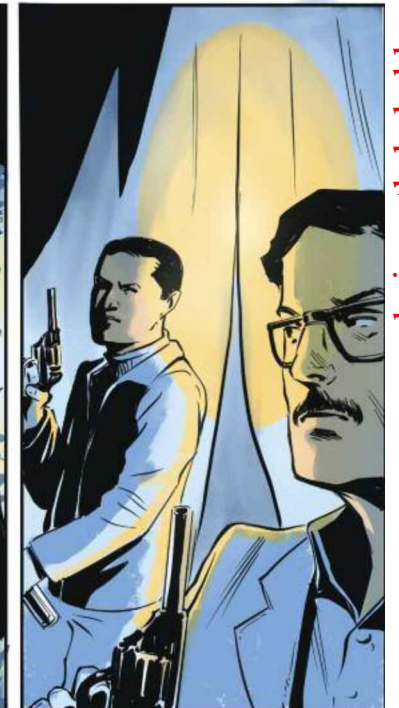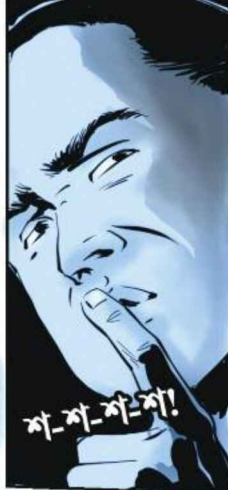
ভেঙ্কটসুন্দরম আর থ্যাকারের গবেষণার বিষয় ছিল প্রাণীদের মস্তিষ্ক নিয়ে। ব্রেনের মধ্যভাগ বা মিড-ব্রেনের লিম্বিক সিস্টেমের একটা ছোট অংশের নাম অ্যামিগডালা। প্রাণীজগতের হাসি-কান্না-রাগ-আতঙ্ক-ভয় ইত্যাদি নানান অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মগজের ছোট্ট ওই অংশটা।

গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যামিগডালায় ইলেকট্রিক শক দিয়ে প্রাণীর চরিত্রে অদ্ভুত-অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। পরিবর্তনটা যদিও ক্ষণস্থায়ী।

লো ভোল্টেজ শক দিলে যে কোনও হিংস্র জানোয়ার অতি নিরীহ গোবেচারা হয়ে যায়। কিন্তু মিডিয়াম ভোল্টেজ দিলে হয়ে ওঠে আরও বহুগুণ হিংস্র এবং খ্যাপা।
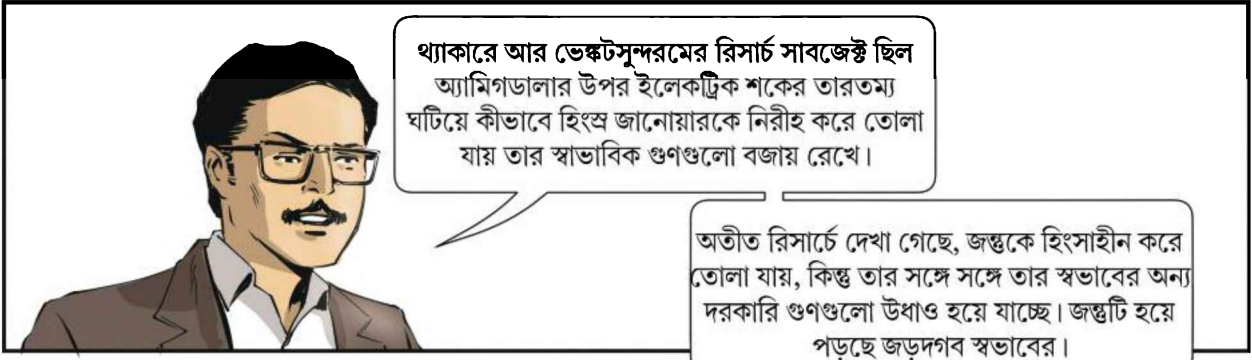
ভেঙ্কটসুন্দরম একদিন গবেষণার সব কাগজপত্র গোপনে সরিয়ে গা ঢাকা দিল। ইচ্ছে, এই জয়েন্ট রিসার্চের কৃতিত্ব সে একাই ভোগ করবে।

ভারতের এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে এই জঙ্গলটা মনে ধরে ভেঙ্কটের। ঘাপটি মেরে নিঃশব্দে গবেষণা চালিয়ে যায় সে।

থ্যাকারের মনে তখন প্রতিশোধের আগুন। গন্ধ শুঁকে শুঁকে একদিন সে ঠিক হাজির হল এখানে। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে।

[চলবে]

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
২ মে ১৯২১ – ২৩ এপ্রিল ১৯৯২
TECHNO INDIA GROUP
A Satyam Roychowdhury initiative